

সংক্ষিপ্ত আত্মজীবনী এবং চাকমা সমাজ ব্যবস্থা



ডাঃ প্রমোদ বিকাশ তালুকদার



কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে “হৃদয়ের দরজা খুলে দিন” বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু।

কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠান বছর খানেক পর “kalpataruboi.org” নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকোনো এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Agrakirti Bhante

সংক্ষিপ্ত আত্মজীবনী
ও
চাকমা সমাজ ব্যবস্থা

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

১৯৯৯ ইং সন



(ডাঃ প্রমোদ বিকাশ তালুকদার)

চাকুরী হইতে অবসর প্রাপ্ত জীবনে

প্রথম সংস্করণ

প্রকাশক :

শ্রীমতি প্রতিভা তালুকদার

পোঃ অভয়নগর, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা - ৭৯৯০০৫

প্রকাশকাল :

১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮৪ ইং

মুদ্রাক্ষর :

শ্রী নবেন্দু ভট্টাচার্য্য

ছাপাকুঠি

পোঃ অভয়নগর, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা - ৭৯৯০০৫

দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রকাশক :

কুমুদ বিকাশ চাকমা

এ্যালবাম পাবলিসার্স

মাঝেরবস্তি, ডাকঘর- রাঙ্গামাটি, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা, বাংলাদেশ
ও

সোমেশচন্দ্র দেওয়ান

কলেজ গেইট, ডাকঘর- রাঙ্গামাটি, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা, বাংলাদেশ

প্রচ্ছদ স্কেচ :

শিল্পী শ্রী গৌতম মনি চাকমা

প্রকাশকাল :

২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৯৯ ইং সন

সর্বসত্ত্বাধিকারী - প্রকাশকদ্বয়

কম্পিউটার কম্পোজ ও মুদ্রণ তত্ত্বাবধান :

বিন্যাস, ৪২ শৈল বিতান, রাঙ্গামাটি

মুদ্রণ :

নিও কনসেপ্ট (প্রাঃ) লিঃ, চট্টগ্রাম

মূল্য : ৬০.০০ (ষাট) টাকা মাত্র

TO WHOM IT MAY CONCERN

AUTHORITY LETTER

This is to authorise Sri Kumud Bikash Chakma and shri Somesh Dewan of Rangamati ((Rangamati Hill District) Bangladesh to reprint and publish the autobiographic book authored by my father late Dr. Pramode Bikash Talukdar under the title **সংক্ষিপ্ত আত্মজীবনী ও চাকমা সমাজ ব্যবস্থা**।

The Original book was published by my (Late) mother Smt. Prativa Talukdar in 1984 from Agartala, Tripura. The copy right of the book would remain with the new publisher.

S. P. Talukdar

Eldest son of

Late (Dr.) P. B. Talukdar

Chandan Nagar, Beltola

Guwahati - 781 028

Guwahati

Dated the 14th May 1998.

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের নিবেদন

আত্মজীবনী বা জীবনী একজন ব্যক্তি সত্তার সারা জীবনে তার জীবনে সংঘটিত শুধু হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, মিলন-বিরহ, উত্থান-পতন এর প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠে না, তিনি যে সমাজে বাস করেন, যে অঞ্চলে বসবাস করেন, যে দেশে তাঁর বাসস্থান অথবা যে দেশ সমূহে সফর, ভ্রমণ বা কার্যোপলক্ষে গমনাগমন করেছেন, সে সমাজ, অঞ্চল বা দেশের অবস্থা, রীতি-নীতি, পরিবেশ প্রত্যক্ষ করেছেন, তাহা অনেকাংশে জানার, অভিজ্ঞতার বা শিক্ষার বিষয়বস্তু নিহিত থাকে, তাহা আর বলার অবকাশ রাখে না। এরূপ আত্মজীবনী বা জীবনী লেখনী আমাদের সমাজে চাক্মা বুদ্ধিজীবী মহলে খুবই অপ্রতুল। সে অভাবটা কিছুটা পূরনের লক্ষে আমরা চাক্মা বুদ্ধিজীবীদের শিক্ষা-দীক্ষায়, সমাজ সেবায়, জাতি-সেবায় অগ্রণী ভূমিকা রেখে গেছেন, যাচ্ছে এইরূপ ব্যক্তিগণের জীবনী ছাপানোর লক্ষ্যে এ পর্যন্ত পুরুষ-মহিলা প্রায় ৫০ (পঞ্চাশ) জন লোকের সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্তের খসড়া সংগ্রহ করেছি এবং সংগ্রহের কাজ অব্যাহত রয়েছে। “পার্বত্য চট্টগ্রামের কৃতি সন্তান” নাম করন করে জীবনমালা প্রকাশ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। শীঘ্রই কাজ আরম্ভ করা হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীরা তথা চাক্মারা ঐতিহাসিক তথ্য মোতাবেক ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষ ভাগে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ থেকে শিক্ষা-দীক্ষায় বিশেষতঃ উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের দিকে নজর দিলেও তাহা খুবই গভীর ভিতর সীমাবদ্ধ ছিল এবং শিক্ষার গতি খুবই মন্ডুর ছিল। ১৮৯৩ ইং সনে রাজা ভুবন মোহন রায় ও অবিনাশ চন্দ্র দেওয়ান (এসিস্টেন্ট ইন্সপেক্টর অব স্কুল) চাক্মা সমাজে দ্বৈতভাবে সর্বপ্রথম ‘এন্ট্রাস’ (প্রবেশিকা পরীক্ষা) পাশ করিলেও বি. এ. পাশ করতে প্রায় আরো বিশ বৎসর এবং এম. এ. পাশ করতে ৪৫ বৎসর সময় অতিক্রান্ত হয়। ১৯১৩ ইং সনে যামিনী কুমার দেওয়ান প্রথম বি. এ. পাশ করেন ও ১৯৩৭ ইং সনে কুমার কোকনা দক্ষ রায় এম. এ. পাশ করেন। মেয়েরা আরো পিছনে পড়ে থাকেন। ১৯৩৮ ইং সনে মনোরমা দেওয়ান প্রথম মেট্রিক পাশ এবং ১৯৬৩ ইং সনে অঞ্জলী তালুকদার প্রথম চাক্মা মেয়ে বি. এ. পাশ করেন (ভারতে)। ১৯৬৫ ইং সনে আরতি চাক্মা ও চন্দ্রিমা

দেওয়ান একইসাথে প্রথম বি. এ. পাশ করেন বাংলাদেশে। উল্লেখ্য যে, ১৯৬৭ ইং সনে আরতি চাক্মা ও চল্লিমা দেওয়ান একইসাথে প্রথম এম. এ. পাশ করেন এবং ১৯৬৯ সনে নমিতা তালুকদার বি. এ. অনার্সসহ এম. এ. পাশ করেন। ১৯৫০ ইং সন পর্যন্ত বাংলাদেশের ১৮ (আঠার) জন মাত্র চাক্মা ছেলে বি. এ./বি.এস.সি পাশ করেন এবং ১৯৭১ ইং সন পর্যন্ত ১১ (এগার) জন চাক্মা মেয়ে বি. এ. পাশ করেন। ১৯৭১ ইং সন পর্যন্ত ৩০ (ত্রিশ) জন চাক্মা ছেলে এম. এ./এম. এস. সি/এম. কম পাশ করেন এবং ১৯৭১ ইং সন পর্যন্ত ৩ (তিন) জন চাক্মা মেয়ে এম. এ. পাশ করেন। স্বাধীনতার পর ১৯৭১ ইং সন থেকে চাক্মা সমাজে উচ্চ শিক্ষার হার দ্রুত বেড়ে যায়।

আমাদের কাছে এ পর্যন্ত চাক্মা বুদ্ধিজীবীদের লিখিত মাত্র ২ (দুই) টি আত্ম-জীবনীমূলক বই হাতে এসেছে- (১) কামিনী মোহন দেওয়ান এর “পার্বত্য চট্টলের এক দীন-সেবকের জীবন কাহিনী (১৯৭০ ইং সন)” ও (২) ডাঃ প্রমোদ বিকাশ তালুকদার এর “সংক্ষিপ্ত আত্মজীবনী ও চাক্মা সমাজ ব্যবস্থা” (১৯৮৪ ইং সন)। বর্তমানে উভয় লেখক তিরোধান করেছেন। তাঁদের লিখিত বই এর মজুত সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে গেছে এবং উক্ত বইগুলি এখন দুস্প্রাপ্য হয়ে পড়েছে। ইতিমধ্যে ডাঃ প্রমোদ বিকাশ তালুকদার এর “সংক্ষিপ্ত আত্মজীবনী ও চাক্মা সমাজ ব্যবস্থা” বইটি নিম্ন প্রকাশকদ্বয় পুনঃ প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। লেখকের জ্যেষ্ঠপুত্র সুযোগ্য সন্তান শাক্য প্রসাদ তালুকদার মহোদয় বইটি পুনঃ ছাপানোর লিখিত ক্ষমতা অর্পণ ও সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন। অনুমতির “সনদপত্র” এতদসঙ্গে দেওয়া হইল। পাঠকবর্গ বইটি পড়ে আনন্দ জ্ঞান ও বিভিন্ন অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারবেন, আশা রেখে বইটি ছাপানোর দায়িত্ব গ্রহণ করলাম। আশা করি বইটি পাঠক সমাজ ও বুদ্ধিজীবী মহলে সমাদৃত হবে।

এক নজরে লেখকের জীবন বৃত্তান্ত সংযোজন করা হইল।

ইতি নিবেদক -

কুমুদ বিকাশ চাক্মা

ও

সোমেশ চন্দ্র দেওয়ান

তারিখ : রাঙ্গামাটি

২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৯৯ ইং



ফুয়ুদ বিবগশ চাক্মা (শ্রবগশব) এয় সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত

তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গামাটি সদর থানার (বর্তমানে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা) ১০৫ নং জীবতলী মৌজা অন্তর্গত ধূল্যাছড়ি নামক গ্রামে ৪ঠা মার্চ ১৯৩৫ ইং তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতার নাম বাবু অশ্বখামা কার্বারী ও মাতার নাম পুন্যাবি চাক্মা এবং তিনি পিতা-মাতার জ্যেষ্ঠ পুত্র।

তিনি ধূল্যাছড়ি নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ১৯৪৭ ইং সনে ছাত্র-বৃত্তি লাভ করিয়া ২য় শ্রেণী পাশ করেন এবং ধূল্যাছড়ি এম. ই. স্কুল থেকে ১৯৫১ ইং সনে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পাশ করেন। ১৯৫২ ইং সনে তিনি রাঙ্গামাটি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে ৭ম শ্রেণীতে ভর্তি হন এবং ১৯৫৬ ইং সনে ২য় বিভাগে মেট্রিক পাশ করেন। তিনি ১৯৫৮ ইং সনে কানুনগোপাড়া স্যার আশুতোষ কলেজ থেকে ৩য় বিভাগে আই. এ. পাশ করেন। ১৯৬০ ইং সনে পারিবারিক ও আর্থিক কারনে ঐ কলেজ থেকে বি. এ. পরীক্ষা দিয়াও ডিগ্রী নিতে ব্যর্থ হন। ১৯৬০ ইং কাণ্ডাই বাঁধে পরিবার উদ্বাস্ত হইয়া দ্বিতীয়বার বি. এ. পরীক্ষা দিতে অপারগ হইয়া জীবিকার সন্ধানে কর্মজীবনে প্রবেশ করিতে বাধ্য হন। ইতিমধ্যে বাস্তুহারা হইয়া ১৯৬০ ইং সনে পরিবার কাচলং রিজার্বে (বর্তমানে বাঘাইছড়ি থানা জীবতলী) স্থানান্তরিত হইয়া যায়। ১৩ই নভেম্বর ১৯৬০ ইং দারোগা বাবু গোলমনি চাক্মা ও স্বর্ণলতা চাক্মা এর ৩য় কন্যা গীতা রাণী চাক্মা এর সাথে বিয়ে হয়।

তিনি ১৬-৬-৬১ ইং তারিখ সরকারী চাকুরী এসিসটেন্ট ওয়েলফেয়ার অফিসার পদে পুনঃর্বাসন বিভাগে রাঙ্গামাটি কাজে যোগদান করেন। ঐ পদে বহাল থাকিয়া পুনর্বাসন প্রকল্প সমাপ্তি হইবার পথে তিনি ২৭-৯-৬৯ ইং তারিখ সমবায় বিভাগে সহকারী সমবায় পরিদর্শক পদে যোগদান করেন এবং রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার লংগদু, বাঘাইছড়ি, নানিয়ারচর ও জুরাছড়িতে ঐ পদে কর্মরত ছিলেন। ১৯৮৫ ইং সনে সমবায় পরিদর্শক পদে পদোন্নতি লাভ করিয়া কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম, লাকসাম, নাঙ্গলকোট ও কুমিল্লা সদর এবং চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনীয়ায় কর্মরত ছিলেন। তিনি চট্টগ্রাম বিভাগে ডিভিশনাল হেডকোয়ার্টারে প্রায় ৩ বৎসর পরিদর্শক পদে এবং রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার জেলা সমবায় অফিসার এর কার্যালয়ে প্রায় ৭ বৎসর ইনস্পেকটর হেডকোয়ার্টার পদে চাকুরী করিয়া বিগত ২৩/৩/৯৭ ইং তারিখ অবসর গ্রহণ করেন।

বর্তমানে তিনি বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া রাঙ্গামাটিতে অবসর জীবন যাপন করিতেছেন।



সোমেশ চন্দ্র দেওয়ান (প্রবণশব্দ) এর সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত

বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বর্গীয় ডাঃ মদন মোহন দেওয়ান (চাকমা উপজাতীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম এল. এম. এফ/১৯০৯ ইং (ডাক্তার) এর কনিষ্ঠপুত্র বাবু সোমেশ চন্দ্র দেওয়ান, ১৯৩৬ ইং সনের ২৯শে সেপ্টেম্বর রাঙ্গামাটিতে (টাউন) পিতার চাকুরীকালীন সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। মাতার নাম শ্রীমতি সরলা বালা দেওয়ান। তাঁহার আদি বাসস্থান নানিয়ারচর থানার বুড়ীঘাট এলাকার ছোট মহাপ্রক্ষম গ্রামে।

রাঙ্গামাটি বয়েজ স্কুল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ হয় ১৯৪৪ ইং সনে। তারপর তিনি ১৯৪৭ ইং সনে রাঙ্গামাটি উচ্চ বিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন। ১৯৪৭ ইং সনে অকস্মাৎ পিতার মৃত্যুতে তিনি ভগ্নিপতি ডাঃ প্রমোদ বিকাশ তালুকদার এর নিকট পশ্চিম বঙ্গ বহরমপুরে কৃষ্ণনাথ কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হন এবং পরবর্তীতে পশ্চিম দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট উচ্চ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। উক্ত স্কুল হইতে তিনি ১৯৫২ ইং সনে ২য় বিভাগে স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ঐ সনেই তিনি পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ রাঙ্গামাটি প্রত্যাবর্তন করিয়া কাননুগোপাড়া স্যার আশুতোষ কলেজে ভর্তি হন ও পরিশেষে কুমিল্লার ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে ১৯৫৬ ইং সনে আই এস সি ২য় বিভাগে পাশ করেন। ঢাকার তেজগাঁও কৃষি কলেজে প্রায় বৎসরাধি অধ্যয়ন করিয়া ভাগ্যের পরিহাস তাঁহার শিক্ষা জীবন সমাপ্তি ঘটে।

রাঙ্গামাটি রাজবাড়ী নিবাসী বাবু অশ্ববিহারী দেওয়ানের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতি গীতা দেওয়ান এর সঙ্গে ১২ই মার্চ ১৯৫৯ ইং সনে তাঁহার শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়া যায়। ১৯৬১ ইং তিনি বান্দরবানে প্রায় ১ বৎসর মহকুমা তথ্য অফিসার (S.D.P.R.O.) পদে এবং ১৯৬২ ইং সন থেকে ১৯৬৯ ইং পর্যন্ত কর্ণফুলী পুনঃবাসন বিভাগে এসিস্টেন্ট ওয়েলফেয়ার অফিসার পদে কর্মরত ছিলেন। ১৯৬৯ ইং সনে তিনি কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনে সহকারী আঞ্চলিক কর্মকর্তা পদে যোগদান করেন এবং পরবর্তীতে একই পদে আত্মকৃত হইয়া উদ্যান উন্নয়ন বোর্ডে যোগদান করিয়া ১৯৮৪ ইং সনে জুন মাস পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। তিনি একই পদমর্যাদায় ১৯৮৪ ইং সনের জুন মাসে থানা সহকারী কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা হিসাবে কৃষি বিভাগে যোগদান করেন এবং ঐ পদে ১৯৯৪ ইং সনের সেপ্টেম্বর মাসে চাকুরী হইতে অবসরগ্রহণ করেন।

বর্তমানে তিনি রাঙ্গামাটিতে অবসর জীবন যাপন করিতেছেন এবং বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছেন।

লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত

- ১। নাম : ডাঃ প্রমোদ বিকাশ তালুকদার
- ২। পিতার নাম : কর্ণ চন্দ্র তালুকদার
- ৩। মাতার নাম : কমল মুখী তালুকদার
- ৪। সঙ্গীর নাম : প্রতিভা তালুকদার
- ৫। স্বত্ত্বের নাম : ডাঃ মদন মোহন দেওয়ান
- ৬। স্বাস্থ্যের নাম : সরলা বালা দেওয়ান
- ৭। জন্ম তারিখ : ২৯শে নভেম্বর, ১৯০৯ ইং সন।
- ৮। জন্ম স্থান : হেদালতছড়া, থানা- লংগদু, পার্বত্য চট্টগ্রাম।
- ৯। শিক্ষা-দীক্ষা : (১) কাটলী নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম শিক্ষা-নবিশ এবং তুলবান উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ১৯২০ ইং সনে ২য় শ্রেণী পাশ করেন। ১৯২২ ইং সনে রাজ্যমাটি সরকারী বিদ্যালয়ে ৩য় শ্রেণীতে ভর্তি হইয়া ১৯২৩ ইং সনে ১ম বিভাগে মেট্রিক পাশ করেন।
(২) ১৯৩০ ইং সনে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল স্কুলে ভর্তি হইয়া ১৯৩৫ ইং সনে এল. এম. এফ (ডাক্তারী) পাশ করেন। (চট্টগ্রাম মেডিক্যাল স্কুলের ১ম Batch এর ছাত্র)।
- ১০। বিয়ে : ১৯৩৪ ইং সনে বিয়ে হয়।
- ১১। কর্মজীবন : (১) ডাক্তারী পাশ করার পর কিছুদিন প্রাইভেট প্রেকটিস করেন এবং ১৯৩৭ ইং সনে রাজ্যমাটি অস্থায়ী চাকুরী গ্রহণ ও পরে রাজ্যমাটি বাজার ফান্ডের অধীনে প্রায় দেড় বৎসর ডাক্তারী চাকুরী করেন।
(২) ১২ই জুন ১৯৩৮ ইং সনে সাব-এসিস্টেন্ট সার্জন পদে চাকুরীতে যোগদান এবং ১৪ই আগস্ট ১৯৪৭ ইং পর্যন্ত ব্রিটিশ ভারতে ঐ পদে চাকুরী করেন। ভারত বিভাগের পর ১৫ই আগস্ট '৪৭ হইতে ভারতে চাকুরীতে বহাল এবং সহকারী সার্জন পদে পদোন্নতি লাভ করিয়া ১৫ই জানুয়ারী '৭১ ইং অবসর গ্রহণ। পুনঃনিয়োগ হইয়া ১৬ই জানুয়ারী '৭৮ ইং তারিখ চূড়ান্ত অবসর গ্রহণ। অবসর গ্রহণ করিয়া ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলায় অভয় নগরে অবসর জীবন যাপন।
- ১২। মৃত্যুবরণ : অভয়নগর এ ১১/১০/৯০ তারিখ মৃত্যু বরণ করেন।

ভূমিকা

রাজনৈতিক বিপ্লবের অমোঘ স্রোতে ভাসমান হইয়া ১৯৪৭ইং, ১৫ই আগষ্ট যখন সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ সরকার বঙ্গদেশ তথা ভারতবর্ষকে দ্বিখন্ডিত করিয়া ভারত ছেড়ে চলিয়া যায়, তখন সরকার বাহাদুরের অনুমোদন ক্রমে আমি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে চাকুরী করার ইচ্ছা প্রকাশ করি (Option দিই) তখন হইতে আমি চাকুরীর খাতিরে স্বজাতি স্বসমাজ ও আত্মীয় স্বজন হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ি এবং সুদীর্ঘ বিচ্ছিন্নতার ফলে আমার পরবর্তী বংশধরেরা যে স্বজাতি ও স্বসমাজ হইতে সম্পূর্ণ অপরিচিত থাকিয়া যাইবে ইহা সুনিশ্চিত। অতএব চিন্তা করিয়া দেখিলাম স্বগোত্রের মধ্যে অথবা নিজ ভবিষ্যৎ বংশধরের মধ্যে পরিচিতি রক্ষার্থ হয়ত কিছুটা কল্যাণ সাধন কিস্বা সহায়ক হইতে পারে যদি আমি আমার আত্ম জীবনের সামান্য কিছু লিপিবদ্ধ করিয়া যাই, এই উদ্দেশ্য নিয়ে আমি এই ক্ষুদ্র পুস্তিকার মাধ্যমে আমার জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ রাখিয়া যাইতে ইচ্ছা করিলাম। ইহা পাঠ করিয়া যদি আমার ভাবী বংশধরের মধ্যে কিস্বা তথা চাক্মা সমাজের মধ্যে কেহ উপকৃত হয় তাহা হইলে আমি নিজকে ধন্য মনে করিব ও আমার পরিশ্রম স্বার্থক হইয়াছে জানিয়া আনন্দ বোধ করিব।

এই পুস্তিকার লেখনী ধরিয়াছি আমার সাময়িক জীবন হইতে অবসর নেওয়ার কয়েক বৎসর পর হইতে, কিন্তু ইহার সমাপ্তি ঘটতেছে আমার জীবন সায়াহ্নে, অতএব এই সুদীর্ঘ সময়ে ঘটনাবলীর যখন যেই অবস্থায় পাইয়াছি তাহাই লিপিবদ্ধ করিলাম। এই কারণে কয়েকটি ঘটনা, সংঘটিত সময়ের সহিত অসঙ্গতি কিছুটা থাকিয়া যাইবে, ইহা অপরিহার্য। আমার ছাত্র জীবন হইতে একটা অভ্যাস ছিল জীবনের বিশেষ ঘটনা গুলি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা। এই অভ্যাসটা আরও বলবৎ হইয়া উঠে আমার চাকুরী জীবনে, বিশেষতঃ যত দিন আমি মিলিটারীতে ছিলাম প্রায় দৈনন্দিন ঘটনা গুলি আমার নিজস্ব Diary তে লিখিয়া রাখিতাম। এই Diary টাই এখন আমার আত্মজীবনী লিখিতে প্রধান সহায়ক।

যদি আমার লেখনীতে কিছু ভুল ভ্রান্তি থাকিয়া যায় তজ্জন্য আমি ক্ষমা প্রার্থী।

- ডাঃ প্রমোদ বিকাশ তালুকদার

পরিচয়

চট্টলা মায়ের পার্শ্বর্ত্য অঞ্চলে কাচলং উপত্যকার অন্তর্গত “হাতীলাদ ছড়া” নামক ছোট্ট একটি গ্রামে ২৯শে নভেম্বর ১৯০৯ ইংরেজীতে আমার জন্ম হয়। আমি যেই বংশে জন্ম লাভ করি সেই বংশকে বলে রাঁয়ী বংশ, আমাদের চাক্‌মা ভাষায় বলে “রাঁয়ী” গোজা। আমার শ্রদ্ধেয় পিতা স্বর্গীয় কর্ণ চন্দ্র তালুকদার মহাশয় ছিলেন উক্ত রাঁয়ী গোজার তালুকদার অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি (শাসক)। সে কালের জাতীয় প্রথানুযায়ী প্রত্যেক গোজার মধ্যে একজন করিয়া শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি থাকিতেন এবং তাঁহাকে তালুকদার অথবা দেওয়ান বলা হইত এবং প্রত্যেক গোজাকে এক একটা “তালুক” রূপে গন্য করা হইত এবং উক্ত তালুকদার নিজের তালুকের অন্তর্গত যাবতীয় লোকের উপর শাসন ক্ষমতা পরিচালনা করিতেন, যেমন খাজনা উশল করা, অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী অপরাধীর প্রতি শাস্তি বিধান, বিশেষতঃ জাতীয় বিচার করা ইত্যাদি। গোজা ব্যতীত আবার গুটি বা গৌত্র ভাগও ছিল। আমাদের গুটির নাম “চেগ গুটি”।

আমার শ্রদ্ধেয় পিতৃদেবের ছিল দুই সংসার তাঁহার ১ম পক্ষের স্ত্রীর নাম ছিল “তারকা” এবং আমার এই বৈমাতৃয় ভ্রাতাদের নাম যথাক্রমে প্রাণ কৃষ্ণ, প্রাণ হরি ও আনন্দ মোহন। প্রাণ কৃষ্ণ অবিবাহিত অবস্থায় অকালে ইহধাম ত্যাগ করেন। ছোট দুই ভাই প্রাণ হরি ও আনন্দ মোহন এখনও বর্তমান। বর্তমান জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রাণ হরি পিতৃদেব প্রদত্ত তালুকের শাসন কার্য পরিচালনা করিতেছেন এবং মধ্যম ভ্রাতা আনন্দ মোহন গৃহ সংসার ত্যাগ করিয়া ত্রিপুরা শাসনাধীনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাস জীবন যাপন করিতেছেন।

আমার বিমাতার মৃত্যুর পর পিতৃদেব ২য় সংসার গ্রহণে বাধ্য হন। পিতৃ দেবের দ্বিতীয় সংসারে আমার দুই ভাই ও দুই ভগ্নী। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রী বীরেন্দ্র কুমার তালুকদার এবং ভগিনী মনোরমা ও নিম্মলিনী কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায় ভগিনী দুই জনেরই অকালে ইহলীলা পরিত্যাগ করিতে হয়। সর্ব্ব কনিষ্ঠ আমি নিজে। আমার দিদিদের মধ্যে নিম্মলিনীর শৈশবে ও মনোরমার বিবাহের পর স্বামী গৃহে মৃত্যু ঘটে। তাঁহার কোন সন্তানাদি ছিলনা, তাঁহার লাম্বা গোজায় বিবাহ হয়। স্বামীর নাম শ্রী সুরেন্দ্র লাল দেওয়ান। মায়নী কবাখালী নিবাসী।

শৈশব কাল

শ্রদ্ধেয় পিতৃদেব তাঁহার সর্ব কনিষ্ঠ এক বৎসর বয়স্ক শিশু পুত্রকে (আমাকে) ভব সাগরে ছাড়িয়া দিয়া ইহ ধাম পরিত্যাগ করিলেন, তারপর আমার পরমারাধ্যা বিধবা মাতা কমল মুখী তাঁহার অপ্রাপ্ত বয়স্ক দুই পুত্র ও এক কন্যাকে লইয়া কোন কুল কিনারার উদ্দেশ্যে সংসার সমুদ্রে সাঁতার কাটিতে আরম্ভ করিলেন ।

স্বর্গীয় পিতৃদেব ছিলেন অতীব সরল, কোমল হৃদয়, পরদুঃখে কাতর এবং অনাথের দুঃখ মোচনে মুক্ত হস্ত ।

অতএব তিনি তাঁহার পুত্র পরিবারের জন্য ভবিষ্যৎ সংস্থানের পরিবর্তে রাখিয়া গেলেন মৃত্যুকালে এক বোঝা ঋণ । পিতৃ বিয়োগের পর আমার বৈমাতৃয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অপ্রাপ্ত বয়সে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া এই অসহায় পরিবারের কর্ণধার রূপে নিজকে নিযুক্ত করিতে বাধ্য হইলেন । অতএব অল্প বয়সে তাঁহার মাথায় সংসারের গুরু দায়িত্ব চাপিল । এক দিকে পিতৃ ঋণ পরিশোধ, অন্য দিকে আমাদের শিক্ষা দীক্ষা দেওয়া ও ভরণ পোষনের ভার ইত্যাদি সাংসারিক নানা জটিল সমস্যার সহিত তুমুল সংগ্রামে লিপ্ত হইলেন ।

আমি প্রায় ৮ বৎসর বয়সে পদার্পণ করিলাম । কিন্তু ঐ সময় আমাদের গ্রামে কোন পাঠশালা না থাকায়, আমার বিদ্যা শিক্ষার কোন আয়োজন হইয়া উঠিল না । আমার বৈমাতৃয় মেজদাদা আনন্দ মোহন আমাকে প্রথমে বাড়ীতে বর্ণ পরিচয় করিয়া দেন । ছোট বেলায় আমি তাঁহাকে বাঘের মত ভয় করিতাম অতএব তিনি যাহা শিখাইতেন তাহা অতীব মনযোগের সহিত শ্রবণ করিতাম । ক্রমে আমার বয়স প্রায় আট বৎসর হইতে চলিল এমন সময় আমার মাতা ঠাকুরাণী অনন্যোপায় হইয়া তাঁহার দূর সম্পর্কীয়া এক বড় ভগিনীর বাড়ীতে আমাকে বিদ্যা শিক্ষার্থ প্রেরণ করিলেন । এই বয়সে আমার একাকী পর-গৃহে বাস করা সম্ভব পর নয় বলিয়া সঙ্গে আমার বড় ভগিনী মনোরমা দিদিও যাইতে হইল । কিন্তু দিদি এক মাস কাল আমার সঙ্গে থাকিয়া স্বগৃহে ফিরিয়া আসিলেন । অতএব আমি সীতা বিসর্জনের ন্যায় একাকী এই নূতন গৃহে পরিত্যক্ত হইলাম দিদি চলিয়া আসার সময় খুব করুণ স্বরে রোদন করিলাম এবং তিনি যতক্ষণ পর্যন্ত দৃষ্টি-গোচর ছিলেন ততক্ষণ পর্যন্ত এক দৃষ্টিতে তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিলাম । ক্রমে তিনি দৃষ্টির বহির্ভূত হইলে আমার শরীরও অবসন্ন হইয়া আসিল এবং

ক্রমে আমার ক্রন্দনের অবসান হইল এবং অনন্যো গতি দেখিয়া ক্রমে এই নূতন গৃহে আমার সমবয়সী ছেলেদের সাথে মিশিয়া মনকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলাম এবং ক্রমে নিজ গৃহের কথা ভুলিয়া গেলাম। এই গৃহ কর্তার নাম নীল চন্দ্র দেওয়ান, খ্যাজী গোজার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি অর্থাৎ শাসক।

পরগৃহে বাল্য জীবন

গ্রামের নাম কাউলী, আমাদের গ্রাম হইতে প্রায় ১৫ পনের মাইল দূরে এক সুবিস্তীর্ণ মাঠে প্রায় ৩০/৪০ খানা গৃহ লইয়া এই গ্রামটি বিরাজ করিতেছিল। এই গ্রামে নদীর ধারে এক বিশাল দুই মহলারবাড়ী, এই বাড়ীতে প্রথমে আমার স্থান হইল।

এই গৃহের কর্ত্রী আমার মাতা ঠাকুরাণীর পূর্বোক্ত দূর সম্পর্কীয়া বড় ভগিনী, সম্পর্কে আমার জেঠিমা, তাঁহার নাম ছিল উর্খিলা তিনি আমার প্রত্যেকটা বিষয়ে বিশেষ ভাবে যত্ন নিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার নিকট হইতে মাতৃবৎ স্নেহ ও আদর যত্ন লাভ করিয়া ক্রমে আমার স্বগৃহ ও স্বমাতার কথা এক প্রকার ভুলিয়াই গেলাম। এই গ্রামের এক প্রান্তে ছোট্ট একটি নিম্ন প্রাইমারী বিদ্যালয় ছিল। এই বিদ্যালয়ে আমার শ্রদ্ধেয়া জেঠিমার আনুকূল্যে প্রথমে আমার বিদ্যা পাঠ আরম্ভ হয়। বিদ্যালয়ে গুরু দেবের ছিল কঠোর শাসন, যদি কোন ছেলে ভাল পড়া না শিখিয়া আসিল তাহার প্রতি পুরস্কার ছিল “বেত্রাঘাত”। কিন্তু আমি আমার সরল স্বভাবের গুণে এবং পাঠে মনযোগীতায় গুরু দেবের এই কঠোর বেত্রাঘাতের করাল কবল হইতে প্রায়ই নিষ্কৃতি লাভ করিতাম। আমার সহপাঠীদের মধ্যে এখানে এক জনের কথা না উল্লেখ করিয়া আর পারিলাম না। তিনি হইলেন আমার জেঠিমার সতিনীর ছেলে, বয়সে তিনি আমার বড় এবং আমার চেয়ে অনেক বলিষ্ঠ। তাঁহার লেখা পড়া বিশেষ কোন মনযোগ ছিলনা, বাড়ীতে সব সময় বালক সুলভ দুষ্টামী করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেন। অতএব বিদ্যালয়ে গুরু দেবের পুরস্কারের অংশ তিনিই বেশী লাভ করিতেন। আমরা দুইজনে একই বাড়ীতে থাকিতাম এবং এক সঙ্গে বিদ্যালয়ে যাইতাম। দিনে যতক্ষণ পর্য্যন্ত বিদ্যালয় থাকি ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমার নিষ্কৃতি ও শান্তি কিন্তু বৈকালে বিদ্যালয় ছুটি হওয়ার পর যখন বাড়ী ফিরিতে থাকি তখন পথে আমার এই সুহৃদ বন্ধুর করাল কবলে পতিত হইয়া আমাকে অশেষ নির্ধাতন ভোগ করিতে হইত। কখনও তিনি অকারণে আমার কান টানিয়া

দিতেন কোন সময় গালে পিঠে চপেটাঘাত করিতেন এবং কখনও অকারণে বল প্রয়োগ করিয়া আমাকে নানা ভাবে নির্যাতন করিতেন। আমি দুর্বল এবং অনন্যো গতি অতএব এই সব নির্যাতন আমাকে অম্লান বদনে সহ্য করিয়া যাইতে হইত।

দারিদ্র নিবন্ধন মা আমার জন্য পরিধেয় বস্ত্রাদি কিনিয়া দিতে পারিতেন না, অতএব আমি শতছিন্ন মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়া স্কুলে যাইতাম, মাঝে মাঝে আমার জেঠীমা আমার মলিন বস্ত্রাদি পরিস্কার করিয়া দিতেন। কিন্তু কিছুকাল পরে আমার জেঠীমা সংসারের সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া হইধাম পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার মহাপ্রয়ানের সঙ্গে সঙ্গে আমার যে দুঃখের মাত্রা আরো বাড়িয়া উঠিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কেননা জেঠীমার মৃত্যুর পর আমার বিভিন্ন জায়গায় স্থান হইল। অর্থাৎ কিছু দিন তাঁহার সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্রের ঘরে এবং কিছু দিন তাঁহার মধ্যম পুত্রের ঘরে অবস্থান করিয়া বিদ্যা শিক্ষা করিতে লাগিলাম। এই সময়ে আমাকে গার্হস্থ্য জীবনের যাবতীয় কাজ কর্মও যথা শক্তি করিতে হইত। এমন কি রাখালের কাজ হইতেও অব্যাহতি পাই নাই। তবে এখন অন্তরের সহিত স্বীকার করি যে তাহাতে আমার ভবিষ্যৎ জীবনের পক্ষে ভাল হইয়াছিল। যদিও ঐ সময় শারীরিক কিছু কষ্ট ভোগ করিয়াছিলাম বটে, এখন উপলব্ধি করিতে পারি যে বাল্য কাল হইতে আমার শরীরটাকে কঠোর শ্রমের মধ্য দিয়া গঠন করিয়াছি বলিয়া এখন আমি যে কোন জায়গায় যে কোন অবস্থাতে শত শারীরিক কষ্টের মধ্য দিয়াও নিজকে পাষাণের ন্যায় অচল অটল ভাবে দাঁড়া করাতে পারি, শত দুঃখ কষ্ট অম্লান বদনে সহিয়া যাইতে পারি। বর্তমান ধৈর্য্য কষ্ট সহিষ্ণুতা এবং কর্মশক্তি ইত্যাদি আমার বাল্যকালে শিক্ষার গুণ। এই গৃহে আমার বৌদিরা আমায় যথেষ্ট আদর যত্ন করিতেন, মাঝে মাঝে আমার মলিন বস্ত্রাদি ধুইয়া দিতেন এবং আমার রোগ শয্যায় গুরুত্বা করিতেন। তাঁহাদের এই আদর যত্নের কথা ইহ জীবন ভুলিতে পারিব না। এখানে গ্রাম্য অশিক্ষিত ছেলেরা হইল আমার নিত্য সহচর অতএব সঙ্গ দোষে আমার নৈতিক চরিত্রের যে কিছু অধঃপতন না ঘটয়া ছিল তাহা অস্বীকার করিতে পারি না। এখানে প্রায় তিন বৎসর কাল বিদ্যা শিক্ষা করিয়া নিজ বাড়ীতে চলিয়া আসিলাম। পর গৃহে এই তিন বৎসর অবস্থানের সময় সঙ্গীদের সাথে আমি চাক্কা খেলা যথা নাদেং খারা (খেলা), ঘিলা খারা ও বাদল নিয়ে পাখী শিকার করা ইত্যাদি করিতাম। দুপুরে স্কুলে থাকার সময় গুরু পত্নীর জন্য ঢেকিতে বারা বানিয়া দিতাম (অর্থাৎ ধান কিস্বা চাল ঢেকিতে পিষিয়া দিতাম) গুরুদেবের নাম ছিল শ্রী জয়

চন্দ্র চাকমা, খ্যেংজী গোজা সম্প্রদায়ভূক্ত। তিনি যাত্রা দলে অভিনয় করিতে খুবই উৎসাহী। অতএব বিদ্যালয়ের বেশীর ভাগ সময় অভিনয়ের মহড়া (Rehearsal) দিতে অতিবাহিত হইত।

স্ব গৃহে প্রত্যাবর্তন

ইতি মধ্যে আমাদের নিজ গ্রাম হইতে প্রায় দেড় মাইল দূরে তুলাবান নামক একটি গ্রামে একটি নূতন উচ্চ প্রাইমারী বিদ্যালয় খোলা হয়, আমি ঐ বিদ্যালয়ে আসিয়া ভর্তি হইলাম। এখানে একবৎসর কাল অধ্যয়ন করিয়া নিম্ন প্রাইমারী বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলাম এবং মাসিক তিন টাকা হারে একটি বৃত্তি লাভ করিলাম। এখানে আমাদের দারিদ্রের কথা কিছু উল্লেখযোগ্য। আমি মাঝে মাঝে নিজে রান্না করিয়া, খাইয়া দেড় মাইল রাস্তা হাঁটিয়া স্কুলে যাইতাম কেননা অনেক সময় বড় বৌদি সাংসারিক নানা কাজে এত ব্যস্ত থাকিতেন যে আমাকে স্কুলে যাওয়ার জন্য ঠিক সময়ে খাওয়ার দিতে পারিতেন না। স্কুলে যাওয়ার পথে অনেক সময় কাচলং নদী সাঁতার কাটিয়া পার হইতাম।

আমার বৃত্তি পরীক্ষার সময় উপস্থিত হইলে সামান্য খরচের অভাবে আমাকে পরীক্ষা কেন্দ্রে উপস্থিত হইতে না পারার অবস্থা হইল।

পরীক্ষা কেন্দ্র ছিল রাজ্জামাটিতে (ঐ জেলার হেড কোয়ার্টার্স) ইতিমধ্যে আমার বয়োঃজ্যেষ্ঠ সহোদর দাদা বীরেন্দ্র কুমার তালুকদার কিছু কাল রাজ্জামাটি উচ্চ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া দারিদ্র নিবন্ধন পড়া ছাড়িয়া বাড়ীতে আসিয়া গৃহ কর্মে আত্মনিয়োগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি সামান্য খরচের জন্য আমার পরীক্ষা বৃথা যায় দেখিয়া তাড়াতাড়ি কিছু গৃহ সামগ্রী বিক্রি করিয়া ১০/১১ টাকা সংগ্রহ করিলেন (তখন ছিল টাকার মূল্য অনেক বেশী) এবং আমাকে সঙ্গে লইয়া পরীক্ষায় ২ দিন পূর্বে ৩৬ মাইল রাস্তা হাঁটিয়া রাজ্জামাটি অভিমুখে রওনা হইলেন। পথে নানিয়ারচড় নামক এক বাজার হইতে (তৎকালীন পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের মধ্যে ধনী শ্রেষ্ঠ রমেশ নাগের দোকান হইতে) আমার জন্য একটি সূতির কোট কিনিয়া দিলেন। ঐ কোটটি পাইয়া নব উৎসাহে অতীব গর্বের সহিত আমি পরীক্ষা দিতে চলিলাম, পরীক্ষার ঠিক পূর্ব রাত্রে আমরা রাজ্জামাটি উপস্থিত হই। রাত্র প্রায় ৭ টার সময় টাউনে প্রবেশ

করলাম। ইতি পূর্বে আমি রাঙ্গামাটি শহর কোন দিন দেখি নাই। অতএব নূতন জায়গা দেখিয়া আমি কৌতূহল দৃষ্টিতে এদিক ওদিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। রাত্রে পথ চলিতে চলিতে দাদা আমাকে বলিতে লাগিলেন ঐ পাহাড়ের উপর রাঙ্গামাটি হাই স্কুল, ঐখানে বোর্ডিং, এই রাস্তা দিয়ে তোমাকে স্কুলে আসিতে হইবে এবং হাই স্কুলে ভর্তি হইলে তোমাকে ঐ বোর্ডিং গৃহে থাকিতে হইবে ইত্যাদি। আমি নীরবে সব শুনলাম। হঠাৎ এক বাসায় ঢুকিয়া দেখি আমার সহপাঠিরা আমার আগে আসিয়া অতীব ব্যস্ততার সহিত পরীক্ষায় জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। হঠাৎ আমাকে দেখিয়া তাহারাও খুব আনন্দ প্রকাশ করিল। পরদিন সকালে উঠিয়া এক সঙ্গে পরীক্ষা দিতে গেলাম, ক্রমে পরীক্ষা শেষ হইল। আমি মাসিক তিন টাকা হারে একটি বৃত্তি লাভ করিয়া কৃতিত্বের সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলাম।

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পুনঃ ঐ স্কুলে এক বৎসর কাল উচ্চ প্রাইমারী অধ্যয়ন করি এবং তৎপর বৎসর রাঙ্গামাটি গভর্নমেন্ট হাই স্কুলে ১৯২২ ইংরেজিতে তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হই। ঐ সময় সমস্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার ভিতর ইহাই ছিল একমাত্র হাই স্কুল। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের নাম ছিল শ্রী অদ্বৈত চরণ রক্ষিত। তাঁহার শাসন ছিল অত্যন্ত কঠোর, অতএব সকলে তাঁহার ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া চলিত। আমিও এই নূতন পরিবেশে নিজেকে সামলাইয়া লইতে আরম্ভ করিলাম।

ছাত্র-জীবন

এই বার আমার প্রকৃত ছাত্র জীবন আরম্ভ হইল। অতি কষ্টে দাদা আমাকে স্কুলে ভর্তি করিয়া দিলেন এবং তিনি নিজেও গুরু ট্রেনিং শিক্ষা কল্পে ঐ স্কুলে ভর্তি হইলেন। অতএব আমরা দুই ভাই এ একই বোর্ডিং এ থাকিতাম। আমি প্রথমে দাদার তত্ত্বাবধানে থাকিয়া অধ্যয়ন করি। বৎসর শেষে পরীক্ষা দিয়া আমি ক্লাশে চতুর্থ স্থান অধিকার করি এবং আমার জনৈক সহপাঠি রাজেন ভায়া প্রথম স্থান অধিকার করে। সে কালে নিয়ম ছিল যাহারা ক্লাশে প্রথম হইতে ৪র্থ স্থান অধিকার করিবে তাহাদের সুন্দর সুন্দর বই ইত্যাদি পুরস্কার দেওয়া হইত। সেই দিন সকালে পুরস্কার গ্রহণ উপলক্ষে স্কুলে যাইয়া আমার রাজেন ভায়া হঠাৎ আমাকে গর্বেবর সহিত বলিল “একি সারাটা বৎসর তুমি তোমার দাদার তত্ত্বাবধানে থাকিয়া পড়াশুনা করিয়াছ, তবুও তুমি প্রথম স্থান অধিকার

করিতে পারিলে না? আর আমিই সেই স্থান অধিকার করিলাম?” আমি কোন প্রতিবাদ না করিয়া নীরবে শুনিয়া গেলাম। কিন্তু সেই কথা আজ পর্য্যন্তও আমি ভুলিতে পারি নাই এবং রাজেন ভায়ার সেই কথাই আমাকে ছাত্র জীবনে যথেষ্ট উপকার করিয়াছিল।

দাদা এক বৎসর পরে ট্রেনিং শেষ করিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিলেন এবং কোন এক গ্রাম্য বিদ্যালয়ে শিক্ষকের কাজে নিযুক্ত হইয়া যাহা বেতন পাইতেন ঐ টাকা দিয়া কোন রকমে আমার পড়ার খরচ নির্বাহ করিতে লাগিলেন। তখন প্রাইমারী স্কুলে শিক্ষকের বেতন ছিল যথাক্রমে Untrained and Trained দের মাসিক ১০ টাকা হইতে ১৫ টাকা। তিনি বোর্ডিং হইতে চলিয়া আসিবার কালীন আমাকে আমার এক খুল্লিতাত বড় ভাই শ্রী নিশিকান্ত তালুকদারের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া আসিলেন। ক্রমে আমি প্রত্যেক পরীক্ষায় প্রথম কিংবা-দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া কৃতিত্বের সহিত সপ্তম শ্রেণীতে উঠিলাম। ঐ বৎসর ক্লাশে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া একটি মাসিক তিন টাকা হারে বৃত্তি লাভ করিলাম এবং স্কুলে মাসিক তিন টাকা বেতন হইতেও মুক্তি পাইলাম এবং বোর্ডিং এ মাসিক তিন টাকা খোরাকী হইতেও অব্যাহতি পাইলাম। ইহাতে দাদা আমার শিক্ষা খরচের গুরুভার হইতেও অনেকটা অব্যাহতি পাইলেন এবং ইহাও আমার স্বভাব ছিল যে বিদ্যালয় ছুটিতে বাড়ী আসিলে ঐ সময়টা বৃথা ভ্রমণে নষ্ট না করিয়া আমার কায়িক শক্তি অনুযায়ী গৃহ কর্মে লিপ্ত হইয়া দরিদ্র পরিবারের কিছু সহায়তা করিতাম এবং এই সময়ে মা বলিতেন ‘যদি জীবনে কলমের উপর নির্ভর করিয়া খাইতে চাও তাহা হইলে মনযোগের সহিত পড়াশুনা কর এবং এই সময়ে কিছু ক্ষেতের কাজ কর্ম করিয়া তোমার পড়ার খরচ তুমি নিজে সংগ্রহ করিয়া লও’। মায়ের এই অমূল্য উপদেশ বাণী এখনও ভুলিতে পারি নাই।

সপ্তম শ্রেণীতে উঠিয়া বিধাতার বিধান মতে আমি এক মারাত্মক পেটের অসুখে আক্রান্ত হইলাম। অনেক প্রকার ঔষধ ব্যবহার করা সত্ত্বেও রোগের কোন উপশম হইল না। পরে দাদা আমাকে বাড়ী লইয়া আসিলেন। পথে এক দেশীয় বৈদ্যের ব্যবস্থা মতে এক দাগ ঔষধ খাইয়া আমার প্রাণ বায়ু বহির্গত হইয়া যায় এই রকম অবস্থা প্রাপ্ত হইলাম। দাদা মহা চিন্তায় পরিলেন। পরে অতি কষ্টে বাড়ী পৌছিলাম, বাড়ীতে অন্য একজন দেশীয় বৈদ্যের চিকিৎসাধীনে থাকিয়া অনেকটা-উপশম লাভ করিলাম। কিন্তু এই অসুস্থ শরীর নিয়াও বিশেষ কোন বই ছাড়া রহিলাম না। পরীক্ষা সন্নিহিত। পূজার

ছুটির স্কুল খোলা হইলে আমি দুর্বল শরীর নিয়া পুনঃ স্কুলে হাজির হইলাম। বার্ষিক পরীক্ষায় ক্লাশে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া কৃতিত্বের সহিত অষ্টম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইলাম। ইহাতে স্কুলের প্রধান শিক্ষক পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত অমৃত লাল লস্কর মহাশয় আমার উপর খুব সন্তুষ্ট হইলেন এবং কৃপাপরবশ হইয়া তাঁহার বাসায় আমার খাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন, যেহেতু হোস্টেলের খাওয়া আমার পেটে সহ্য হইত না। স্থানীয় পুলিশ হাসপাতালের ডাক্তার বাবুকে ডাকাইয়া আমার ব্যারামের চিকিৎসার জন্য প্রধান শিক্ষক মহাশয় নিজে ডাক্তার বাবুকে অনুরোধ করিলেন। তৎপর আমার পড়াশুনার সঙ্গে সঙ্গে নিজের রোগের চিকিৎসাও করিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে আমার খুরতুত ভাই শ্রীযুক্ত নিশি কান্ত তালুকদার মহাশয় নিজের পড়াশুনা সমাপ্ত করিয়া স্থানীয় ডেপুটি কমিশনারের অফিসে এক চাকুরী লইলেন। বোর্ডিং এর খাওয়া আমার পেটে সহ্য হইত না বলিয়া আমিও দাদার বাসায় চলিয়া আসিলাম। এই বাসায় থাকিয়া আমি আমার রোগের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে ১৯৩০ ইংরেজীতে মার্চ মাসে মেট্রিকুলেশন (Matriculation) পরীক্ষা দিলাম। আমার সুহৃদ বন্ধু রাজেন ভায়াও দিল। উভয়ে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইলাম। কিন্তু ঐ সময়ে আমার পরীক্ষা খরচের জন্য দাদাকে ভিক্ষার ঝুলি হাতে লইয়া পরের দ্বারস্ত হইতে হইল। এই সময়ে আমার মধ্যম দাদাও তাঁহার সামর্থ্য অনুযায়ী আমার নিকট আর্থিক সাহায্য প্রেরণ করিলেন।

আমাদের পরীক্ষার কেন্দ্র ছিল চট্টগ্রাম শহরে। পরীক্ষার পূর্বে আমার কোন দিন চট্টগ্রাম শহর দেখিবার সৌভাগ্য হয় নাই। অতএব পরীক্ষা দিতে যাইয়া শহর দেখিব এই আশায় আমি আনন্দে আত্মহারা হইলাম। শহরে ভদ্রলোকেরা জুতা পায়ে ভ্রমণ করে এবং আমার অন্যান্য সহপাঠীরাও সকলে জুতা পায়ে পরীক্ষা দিতে যাইবে, অতএব আমিও অতি কষ্টে এক জোড়া ডারবী জুতা ক্রয় করিতে বাধ্য হইলাম। পরীক্ষার কিছু দিন পূর্ব হইতে আমার শুভাকাঙ্ক্ষী গুরুদেব শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নাথ তালুকদারের সহিত নানা গল্প গুজবে সন্ধ্যা ভ্রমণে বাহির হইয়া জুতা পায়ে হাঁটার প্রাকটিশ (Practice) করিতে শুরু করিলাম। গুরু দেব রাজেন্দ্র নাথ তালুকদার ছিলেন আমাদের চাক্মাদের মধ্যে প্রথম Govt. High School a graduate teacher.

১৯৩০ ইংরাজী, মার্চ মাসে আমাদের Matric পরীক্ষা শেষ হইয়া যাওয়ার ঠিক

সাতদিন পরে চট্টগ্রামে অস্ত্রাগার লুণ্ঠন হয়, যাহা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে। বিপ্লবী নেতা সূর্য্য সেন ও অনন্ত সিংহের নেতৃত্বে এই সংগ্রাম পরিচালিত হয়।

ডাক্তারী শাস্ত্র অধ্যয়ণ

Matriculation পরীক্ষা দিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম, পরীক্ষার ফল বাহির হইতে প্রায় তিন মাস লাগিবে অতএব এই সময়ে আমি বাড়ীর কৃষি কাজে নিযুক্ত হইয়া আমার ভবিষ্যৎ উচ্চ শিক্ষার উপায় উদ্ভাবন উদ্দেশ্যে আমার অগ্রজ বীরেনদা সহ গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলাম। ইতি মধ্যে আমার অগ্রজ তিন ভাই তিনটি পৃথক পরিবারে বিভক্ত হইয়া পড়েন। আমি বীরেন দার দিকে যোগ দিলাম।

অনেক সময় ইচ্ছা করিয়া ছিলাম কলেজে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিব এবং অনেক সময় মনে করিয়া ছিলাম সাধারণ কোন একটা টেকনিকেল Technical লাইনে শিক্ষা লাভ করিয়া সহসা একটি উপার্জ্জনের পথ ধরিয়া লইব। কিন্তু দারিদ্রতা বশতঃ কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিলাম না। একদিন হঠাৎ রাজ্যমাটি হইতে নিশি দাদার এক পত্র পাইয়া জানিতে পারিলাম যে আমি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছি, তিনি আরও লিখিলেন “যদি কলেজে কিম্বা অন্য কোন লাইনে ভর্তি হইতে হয়, তাহা হইলে তুমি অগৌণে রাজ্যমাটি চলিয়া আস এবং তোমার শিক্ষার খরচ বাবদ আমি মাসিক ১০ দশ টাকা সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি।” এই চিঠি পাইয়া বাড়ীতে সকলে খুব খুশী হইলেন এবং দাদা এক স্বস্তির দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন “যদি শ্রীমান নিশি মাসিক ১০ দশ টাকা সাহায্য দেয় তাহা হইলে তোমার বাকী খরচটুকু আমি ঘরের চাল বিক্রি করিয়া হইলে ও নির্বাহ করিব। অতএব তুমি রাজ্যমাটি চলিয়া যাও এবং তোমার রুচি অনুপাতে কলেজে কিম্বা Medical Line এ ভর্তি হও।” এই বলিয়া তিনি ১০ দশটি টাকা হাতে দিয়া আমাকে বিদায় করিয়া দিলেন। রাজ্যমাটি আসিয়া নিশি দাদার পরামর্শ মতে Medical Line এ ভর্তি হওয়াই শেষ সিদ্ধান্ত করিলাম। গুরুদেব রাজেন বাবু আমাকে চট্টগ্রাম Medical School এ ভর্তি করিয়া দেওয়ার জন্য মাননীয় Sub Deputy Collector নগেন্দ্র নাথ দেওয়ানের নিকট এক অনুরোধ পত্র লিখিয়া দিলেন। ঐ পত্র লইয়া আমি চট্টগ্রাম রওনা হইলাম। নগেন্দ্র বাবু আমার

প্রতি কৃপা পরবশ হইয়া আমাকে উক্ত Medical School এ ভর্তি হইবার কালীন যথেষ্ট সাহায্য করিয়া ছিলেন । । ঐ সময় চাকমা জাতীয় অন্যতম নেতা শ্রীযুক্ত কামিনী মোহন দেওয়ানও আমাকে কিছু আর্থিক সহায়তা দান করেন । অসময়ে তাঁহার নিকট হইতে আর্থিক সাহায্য পাইয়া আমার অশেষ উপকার সাধিত হইল । তাঁহার এই মহৎ আর্থিক সহায়তার জন্য আমি তাঁহার নিকট চির কৃতজ্ঞ । আমার ডাক্তারী শাস্ত্র অধ্যয়ন কালে নিশি দাদা তাঁহার সম্বল অনুপাতে নিয়মিতভাবে আমাকে আর্থিক সাহায্য করিতেন । তাঁহার এই মহৎ দানের জন্য আমি তাঁহার নিকটও কৃতজ্ঞতা বন্ধনে চিরবন্ধী ।

যথা কালে আমি ডাক্তারী শাস্ত্র অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া ডাক্তার উপাধী (L.M.F) লাভ করিলাম ১৯৩৫ ইংরেজীতে কল্লনা ছিল জীবনে নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে না পারিলে কখনও বিবাহ করিব না কিন্তু কালচক্রে পতিত হইয়া আমার সেই দৃঢ় সঙ্কল্প পল্ট হইয়া যায় এবং যখন আমি Medical School এ ৪র্থ বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি তখন শ্রীযুত ডাক্তার মদন মোহন দেওয়ানের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী প্রতিভা দেওয়ানের সহিত আমার শুভ পরিণয় কার্য্য সুসম্পন্ন হয় । বিবাহে বিশেষ কোন আমোদ প্রমোদের আয়োজন হইল না স্বস্তুর মহাশয় তাঁহার কন্যা রত্ন সম্প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে কিছু আর্থিক সাহায্যও করিলেন । এই সময়ে আমি উপার্জনোন্মুখ ছিলাম বলিয়া আমার দাম্পত্য জীবনটা বিশেষ সুখপ্রদ হইয়া উঠিল না । অতএব আমার এই বক্তব্য যদি কেহ আমার ন্যায় বেকার অবস্থায় থাকিয়া বিবাহ করে তাহা হইলে সেও আমার মত জীবনে মহা ভুল করিয়া বসিবে ।

উপার্জনের পথ ধরিয়া না লওয়া পর্য্যন্ত বিবাহ করা উচিত নয় ।

উপরোক্ত চট্টগ্রাম Medical school টি ১৯৩০ ইংরেজীতে স্থাপিত হয় এবং ঐ স্কুলে আমি ছিলাম একজন প্রথম Batch এর একমাত্র চাকমা ছাত্র ।

কর্ম জীবন

আমি নিজে অর্থোপার্জনে অসমর্থ ছিলাম বলিয়া বিবাহের কয়েক বৎসর পর পর্য্যন্ত আমাকে সম্পূর্ণ পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইল । ডাক্তারী পাশ করার সঙ্গে সঙ্গে আমার কোন চাকুরী হইল না, প্রথম এক বৎসর সাধারণ ভাবে গ্রামে Practice

আরম্ভ করিলাম কিন্তু বিশেষ কোন সুবিধা হইয়া উঠিল না। তারপর ১৯৩৭ ইং প্রথম জানুয়ারীতে অস্থায়ী ভাবে একটি মাসিক ৫০ পঞ্চাশ টাকা বেতনের চাকুরী পাইলাম। আমার কাজ ছিল গ্রামাঞ্চলে ঘুরিয়া Cholera Epidemic এর সময় নানা জায়গায় Cholera Inoculation দেওয়া। ইহার পর পার্শ্বত্যা চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত বাজার ফান্ডে একটা স্থায়ী ভাবে চাকুরী পাইলাম। বেতন ছিল মাসিক ৬০ ষাট টাকা। প্রত্যেক মাসে অন্ততঃ ২০ দিন বিভিন্ন বাজারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মফঃস্বল করিতে হইত।

১লা এপ্রিল বৃহস্পতিবার ১৯৩৭ ইংরেজী সকাল ৬টা ৩৭ মিনিটের সময় আমার প্রথমা কন্যা কল্যাণীয়া অনুরাধা ভূমিষ্ট হয়। ইহাতে আমার সাংসারীক খরচের মাত্রা আরও একটু বাড়িয়া উঠিল সন্দেহ নাই। এই সময় আমি অভাবের তাড়নায় চাকুরী সন্ধানে পাগলের ন্যায় এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিতে লাগিলাম। আমার এই নিদারুণ দৃশ্য দেখিয়া বোধ হয় ভগবান আমার প্রতি সদয় হইলেন, তারপর আমার পূর্বোক্ত চাকুরীটা জুঠিয়া গেল। এই অল্প আয় নিয়ে কোন প্রকারে আমার সাংসারীক খরচ নির্বাহ করিতে লাগিলাম। তবুও অনেক সময় আমার শ্বশুর মহাশয় এবং বীরেনদার উপর নির্ভর করিয়া আমার পরিবারের ভরণ পোষণ করিতে হইয়াছিল। এখানে উল্লেখযোগ্য তখন এক টাকা (রোপ্য মুদ্রা) দিয়ে এক আড়ি (অর্থাৎ পাকা আড়ি হইলে ১৬ সের এবং কাঁচা আড়ি হইলে ১৪সের) চাউল পাওয়া যাইত। বলাবাহুল্য বর্তমানে সেই চাউলের মূল্য প্রতি সের চার টাকা এবং ভবিষ্যত যে কি দাঁড়াইবে এক মাত্র ভগবানই জানেন। এত অর্থনৈতিক তারতম্য ঘটিয়াছে মাত্র গত ৪৫ বৎসর ব্যবধানের মধ্যে।

যাই হউক, এই ভাবে প্রায় দেড় বৎসর কাল অতিবাহিত করার পর পরম মঙ্গলময় ভগবান বুদ্ধের অনন্ত করুণায় ১৯৩৮ ইংরেজী ১২ই জুন তারিখে Bengal Medical Service এ Sub Assistant Surgeon পদের জন্য একটি Appiontment পাইলাম। এই চাকুরীতে যোগ দেওয়ার পর আমার পূর্বোক্ত বাজার ফান্ডের চাকুরী ছাড়িয়া দিলাম। চাকুরী লাভ করিলাম এবং এত দিন পরে জীবনের বহু আকাঙ্ক্ষীত কর্মক্ষেত্র নির্দিষ্ট হইয়া গেল, অতএব এই বার আশা করিলাম বহু দিনের দারিদ্র নিপীড়িত জীবনে কিছু শান্তি লাভ করিব। এবং আরও আশা করিয়াছিলাম কোন এক জায়গায় স্থায়ীভাবে চাকুরী করিয়া সাংসারীক জীবনের কিছু সুখ ভোগ করিব এবং

আমার চির অভাগিণী মায়ের অন্তরেও কিছু শান্তির বাতাস বহিবে। কিন্তু যার অদৃষ্টে শুধু দুঃখই চির সহচর সে চির দিনই কেবল দুঃখ যন্ত্রনা ভোগ করিবে, আমার অদৃষ্টেও তাই হইল। চাকুরী জীবনের প্রথম হইতে আমি আমার ছাত্র জীবনের ঋণ পরিশোধ করিতে লাগিলাম। এমন কি নিজে নিতান্ত দরিদ্র অবস্থায় জীবন যাপন করিয়াও এই ঋণ শোধ করিতে আরম্ভ করি। মনে করিয়াছিলাম এই ঋণ শোধ করাই আমার জীবনের প্রথম কর্তব্য। অতএব ২/৩ বৎসরের মধ্যে আমি আমার ছাত্র জীবনের যাবতীয় ঋণ পরিশোধ করিয়া নিজকে ঋণ মুক্ত করি। ছাত্র জীবনে যাঁহারা আমাকে আর্থিক সাহায্য দান করিয়াছিলেন, আজ যে আমি তাহাদের যাবতীয় টাকা পরিশোধ করিয়াছিলাম ইহাই আমার জীবনের এক মহা শান্তি এবং আনন্দ, তখন অভাবের তাড়নায় আমাকে এমন কি এক টাকা পর্য্যন্ত সুহৃদ দাতাদের নিকট হইতে গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। (ঐ সময়ের একটি রৌপ্য মুদ্রার মূল্য বর্তমানে প্রায় ৩০ ত্রিশ টাকার সমান) তখন এক টাকা আর্থিক সাহায্য আমার কাছে যথেষ্ট বলিয়া মনে হইয়াছিল এবং তাহা সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলাম।

সমস্যা

এই চাকুরীর প্রথম আড়াই বৎসর চট্টগ্রাম ও পার্শ্ববর্তী চট্টগ্রামে অন্তর্গত বিভিন্ন জায়গায় চাকুরী করি, তন্মধ্যে বড়কল জায়গাটির কথা কিছু উল্লেখযোগ্য। এই জায়গায় আমি দুই বৎসর কাল চাকুরী করি, অতএব এখানে আমি বেশ একটা ছোট খাটো সংসার পাতিয়া বসিয়াছি। এখানে ১৯৩৯ ইংরেজী ৪ঠা জুলাই মঙ্গলবার অপরাহ্ন বেলা ৫.৪৫ মিনিটের সময় আমার প্রথম পুত্র শ্রীমান শাক্য প্রসাদ তালুকদারের জন্ম হয় (তাহার ডাক নাম শ্যামল)।

১৯৪০ ইংরেজীর শেষ ভাগে আমি এই জায়গা হইতে একই জেলার অন্তর্গত রামগড় নামক Sub Divisional Hospital এ বদলী হই। তখন ঐ হাসপাতাল হইতে আমার স্বস্তর মহাশয় চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করেন এবং আমি তাঁহার নিকট হইতে উক্ত হাসপাতালের কার্যভার গ্রহণ করি। এই সময় পৃথিবী ব্যাপী এক মহা দুর্যোগ দেখা দিল।

“পৃথিবী ব্যাপী দ্বিতীয় মহাসমর”, ১৯৩৯ ইংরেজীর ৩রা (3rd September 1939) সেন্টেম্বর তারিখ জার্মানীর সর্বাধিনায়ক হের হিটলার হঠাৎ পোলেণ্ড রাজ্য আক্রমণ করে। এই যুদ্ধ দেখিতে দেখিতে সমগ্র ইউরোপে ছড়াইয়া পরে এবং অল্প দিনের মধ্যে পৃথিবী ব্যাপী মহা সমরে পরিণত হয় (The Second world war)।

এই পৃথিবী ব্যাপী সর্ব যোগকর যুদ্ধে মাননীয় বৃটিশ সরকার কর্তৃক আমিও যুদ্ধে আহত সৈনিক দিগের চিকিৎসার্থে যুদ্ধে যোগদানের জন্য আহত হইলাম। হঠাৎ যেন বিনা মেঘে বজ্রপাতের ন্যায় এই রকম কড়া হুকুম পাইয়া আমার আকস্মিক আতঙ্কে পায়ের নখ হইতে মাথার চুল পর্যন্ত কম্পমান হইয়া উঠিল সন্দেহ নাই। হুকুম আসিল “আমাকে যুদ্ধে যোগ দিতেই হইবে” নচেৎ আমার চাকুরী থাকিবে না এবং উপরন্তু আমাকে এক হাজার টাকা জরিমানা দিতে হইবে, এমন কি সরকার বাহাদুরের আদেশ অমান্য করিলে কারাদণ্ড পর্যন্ত হইতে পারে, এই রকম অবস্থা দাড়াইল। কিন্তু এই ভয়াবহ জীবন মরণ সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে আমাকে জাতি ও দেশ ভেদে বিচার করিতে গেলে এই রকম আতঙ্কিত হইয়া উঠা আমার পক্ষে মোটেই অস্বাভাবিক ছিল না। কেন না যে চাক্মা জাতি আ-জীবন কুপ মন্ডুকের ন্যায় নিজের সমাজের গভী ছাড়িয়া বহির্জগতে এক পা-ও অগ্রসর হয় নাই এবং যে জাতি কোন দিন যুদ্ধ বিগ্রহের সম্মুখীন না হইয়া প্রকৃতি মায়ের অতি নিরীহ সন্তানের ন্যায় চট্টলা মায়ের নিভৃততম পার্বত্য কন্দরে পুরুষ পরম্পরায় অবস্থান করিয়া সরল জীবন যাপন করিয়া আসিতেছে সেই জাতিতে জন্মলাভ করিয়া আমা হেন এক জন নিরীহ লোকের পক্ষে কি প্রকারে হঠাৎ এই সর্ব যোগকর মহাসমরে একাকী যোগদান করা সম্ভব হইতে পারে?

এই বার আমি মহা সমস্যায় পরিলাম বটে। দেখিলাম আমার উভয় সঙ্কট। যুদ্ধে যোগ না দিলেও যে চাকুরী থাকে না এবং যুদ্ধে যোগ দিলেও যে প্রাণ নিয়ে ফিরে আসবার আশা কম। আশাকরি পাঠক আমার এই জীবন মরণ সন্ধিক্ষণে আমাকে ভীর্ণ কিম্বা দোষী বলিয়া সাব্যস্ত করিবেন না। যুদ্ধে যাইব? এই কথা একবার চিন্তা করিলে অবশ্য আমার হৃদয় তন্ত্রী আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিত বটে কিন্তু সত্য বলিতে কি, আমি কখনও নিজের প্রাণের মমতায় ভয় পাই নাই। আমি কেবল ভাবিয়া ছিলাম ঈশ্বর না করুক যদি আমার যুদ্ধে যাইয়া মৃত্যু ঘটে তাহা হইলে আমার পুত্র পরিবারের কি গতি হইবে? আরও চিন্তা করিলাম আমিও শৈশবে পিতৃহারা, ঐ সময় আমাকে কে রক্ষা

করিল? যিনি সৃষ্টি কর্তা তিনিই রক্ষা কর্তা। পিতামাতা উপলক্ষ মাত্র। ভগবান রক্ষা করিলে এ জগতে কেহ কাহাকে মারিতে পারে না এবং তিনি মারিতে গেলে কেহ কাহাকে রক্ষাও করিতে পারে না। এতএব আমি এই সিদ্ধান্তে আসিলাম “আমি যুদ্ধে যোগদান করিবই” তবে যাওয়ার পূর্বে গুরুজনের মতামত লওয়া এবং নিজের সহধর্মিণীকে একবার জিজ্ঞাসা করা উচিত মনে করিলাম। অতএব আমি একে একে আমার বৃদ্ধা মাতা, বড় ভাই, শ্বশুর শ্বশুরী এবং নিজের সহধর্মিণীকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিলাম। কিন্তু আমার এত মন্দ অদৃষ্ট যে কাহারও নিকট হইতে কোন সঠিক জবাব পাইলাম না এবং সকলে মৌনব্রত ধারণ করিলেন যেন আজ আমি তাঁহাদের নিকট কোন এক ঘোর অপরাধে অপরাধী। বুঝিলাম “মৌন সম্মতি লক্ষণ” অর্থাৎ আমি যুদ্ধে যোগদান করি ইহা সকলের ইচ্ছা। কিন্তু মুখ খুলিয়া কেহ আমার নিকট এ কথা প্রকাশ করিতে সাহস পাইতেছেন না।

মা একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া করুণ স্বরে বলিলেন- এ জগতে বিধাতার বিধান ছাড়া কোন কাজই হইতে পারে না। ইহাও তাঁহার বিধান জানিও এবং না গেলেও যে লোকে কুৎসা করিবে। বুঝিলাম “আমার মা সম্পূর্ণ অদৃষ্ট বাদী, ভগবানের প্রতি তাঁহার অটল বিশ্বাস এবং অন্তঃ করণে তাঁহার জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রচন্ড সূর্য্য কিরণের ন্যায় ভীষণ তেজ”। সৌভাগ্যক্রমে আমি এই বীর মাতার গর্ভে জন্মলাভ করিয়াছি। একবার নিজের সহধর্মিণীকে জিজ্ঞাসা করিলাম। অনেকক্ষণ নীরব থাকার পর তিনিও অস্ফুট স্বরে এবং অশ্রুপূর্ণ লোচনে অনেকটা মায়ে মতই জবাব দিলেন এবং বলিলেন না গেলেও যে চাকুরী থাকেনা? অতএব বুঝিলাম তিনিও মায়ে মত একটি বীর রমণীই বটে। তাঁহার অন্তঃকরণে দুর্জয় সাহস। সৌভাগ্যক্রমে এই বীর রমণীকেও স্ত্রী রূপে লাভ করিয়াছি। তারপর দাদাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। বীরেনদা জবাব দিলেন “তোমার সাহস না ধরিলে যাইওনা, না গেলে অবশ্য একটু কষ্টে পরিতে হইবে বটে তবে সকলে একত্রে থাকিয়া গরীব খানা খেলেও অন্ততঃ মনের শান্তিটুকু থাকিবে।” এবার চিন্তা করিয়া দেখিলাম- তিনিই প্রকৃত ভ্রাতৃ প্রেমের একটি নিদর্শন দেখাইয়া নিঃস্বার্থভাবে জবাব দিলেন।

দাদা আমাকে ছোট বেলায় লালন পালন করিয়াছিলেন এবং শিক্ষা দীক্ষা দিয়া মানুষ করিয়াছেন এবং আমাকে সরকারী চাকুরীতে দিয়ে তাঁহার বহু দিনের মন বাসনা পূরণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই চাকুরীর মোহ পরিত্যাগ করিয়া আমাকে যুদ্ধে

যোগদান না করিতে বলিতেছেন। অতএব তিনি বোধ হয় ভাবিয়াছিলেন আমার জীবনের বিনিময়ে টাকা কিছুই নহে।

এই সঙ্কট মুহূর্তে আমার নানা ভাবনার উদয় হইল। বন্ধু বান্ধবদের মধ্যেও আমাকে অনেকে বারণ করিল এবং বলিল এই পৃথিবী ধ্বংশী যুদ্ধে যাহারা যাইবে তাহারা আর প্রাণ লইয়া ফিরিতে পারিবে না। কারণ এই বার কার যুদ্ধ সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ধরণের (Scientific-war) এই সব নানা কথা শুনিয়া আমার অন্তঃকরণ আরও ভয়ে কম্পিত হইয়া উঠিল।

প্রায় একমাস কাল গভীর চিন্তায় নিমগ্ন রহিলাম পরে ভিতর হইতে অন্তর্যামী যেন বলিয়া উঠিল “যুদ্ধে যাও তোমার মঙ্গল হইবে।” অন্তরের নিভৃততম কোন হইতে একরূপ যেন একটু সারা দিয়া উঠিল। মৃত্যুত একদিন আসিবেই, তবে ভগবান রক্ষা করিলে কেহ মারিতে পারিবে না - এই রকম জীবনের উপর দিয়ে বিপদ আমার ছাত্র জীবনেও কয়েকবার ঘটিয়া গিয়াছে। একবার আমি ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়িবার সময় একজন পাগলা পুলিশের বন্দুকের গুলি আমার পিঠের উপর দিয়ে চলিয়া যায় এবং আর একবার চট্টগ্রাম শহরে মুসলমানদের হরতাল এর সময়ও (সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা) আমার জীবনের উপর দিয়ে বিপদ গিয়াছিল। কিন্তু ভগবান সহায় ছিলেন বলিয়া ঐ যাত্রা হইতে রক্ষা পাই। এই সব পূর্বের বিপদের স্মৃতিগুলি মনে উদিত হইতে লাগিল।

অনেক চিন্তার পর স্থির করিলাম যুদ্ধে যাওয়া যদি আমার উপর ভগবানের বিধান হইয়া থাকে তাহা হইলে তাঁহার অভিলাষ পূরণ করনার্থে আমি যুদ্ধে যাইব না কেন? যুদ্ধে যাওয়াই স্থির সিদ্ধান্ত করিলাম। অতএব আমি যুদ্ধে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। যুদ্ধে যোগ দেওয়ার সম্মতি জানাইয়া আমার উপরিওয়ালা Civil Surgeon এর নিকট লিখিলাম। যথা সময়ে আমার Medical Examination হইয়া গেল। Medically Fit হইয়া “A” Category Service এর অন্তর্ভুক্ত হইলাম। অর্থাৎ FiT for Military Service in the whole world. ঐ সময়ে Military Service এ তিন প্রকার শ্রেণী বিভাগ করা হইত। যেমন - “A” “B” এবং “C” Category যাহারা “A” শ্রেণীভুক্ত তাঁহারা পৃথিবীর যে কোন জায়গায়, যে কোন যুদ্ধ ক্ষেত্রে, যে কোন অবস্থায় কাজ করিতে সক্ষম বলিয়া গণ্য। যাহারা “B” শ্রেণীভুক্ত হইবে তাহারা ভারতবর্ষ সীমার মধ্যে মিলিটারী কাজ করার যোগ্য, তাহাদের

ভারতের বাহিরে যাইতে হইবে না। আর যাহারা “C” শ্রেণীভুক্ত তাহারা কেবল যেখানে কোন যুদ্ধ নাই অর্থাৎ Peace zone এর ভিতর সামরিক কাজের জন্য যোগ্য বলিয়া গন্য হয়। আর আমি পৃথিবীর যে কোন রণক্ষেত্রে সামরিক কাজের জন্য যোগ্য বলিয়া গন্য হইয়া গেলাম।

বিদায় যুদ্ধ-যাত্রা

যুদ্ধে যাইব স্থির সিদ্ধান্ত হইল। যাত্রা করিব শ্বশুরালয় হইতে, অতএব আমার বড় দাদা ও ছোট দাদা আমাকে বিদায় সম্ভাষণ জানাইবার জন্য ঐ বাড়ীতে আসিলেন। আমি যুদ্ধ উপলক্ষ্যে সুদূর বিদেশে যাত্রা করিব এই কারণে বোধ হয় আজ সকলের মুখের উপর কেমন একটা হাসি নাই, আমোদ নাই। আমার বৃদ্ধা মা আমার সুদূর প্রবাসে মঙ্গল কামনা করিয়া ভগবান বুদ্ধের সকাশে প্রার্থনা করিলেন। এবং আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন “তুমি যেখানে যে অবস্থায় থাক না কেন, সব সময় ত্রিরত্ন বন্দনা করিবে” বিপদের সময় ত্রিরত্নের বন্দনা করিলে তুমি নিশ্চয়ই বিপদ মুক্ত হইবে। ইত্যাদি বলিয়া তিনি আমাকে আরও কত কিছু উপদেশ দিলেন। মায়ের এই উপদেশ বাণী আমি সব সময় পালন করিয়াছি। অতএব এবারও যুদ্ধে যাওয়ার প্রাক্কালে মার সব উপদেশ শিরোধার্য্য করিলাম। আমার শ্বশুর মহাশয় ও দাদারা একে একে আমার মঙ্গল কামনা করিয়া আশীর্ব্বাদ বাণী বর্ষন করিলেন। আমার বন্ধু বান্ধবেরাও সকলে শুভেচ্ছা কামনা করিল।

আমার বড় মেয়েটি জিজ্ঞাসা করিল “বাবা তুমি কোথায় যাইবে?” আমি বলিলাম “যুদ্ধে যাইব” কোথায়? কখন আসিবে? আমাদের সঙ্গে নিবে কি? ইত্যাদি আরও কত প্রশ্ন করিয়া বসিল। এমনি আমার দুই বৎসর বয়স্ক ছেলেটিও যদিও আমার বিদায়ের কারণ বুঝিতে পারিল না তথাপি কিছু এটুকু ধারণা তাহার মনেও জাগিল যে আমি তাহাকে ছাড়িয়া কোথাও চলিয়া যাইতেছি। অতএব সে আর আমার পাশ কিছুতেই ছাড়িবে না। আমার স্ত্রী আমাকে যথোচিত প্রবাস সজ্জায় সজ্জিত করিল। যথাসময়ে গুরুজনের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া বিধাতার বিধান মতে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া পৃথিবী ধংশী দ্বিতীয় মহাসমরে যোগদান করিবার জন্য ২৭শে জানুয়ারী ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে আমার শ্বশুর মহাশয়ের রাজ্যমাটি বাসভবন হইতে ভোর ৭ ঘটিকায় সময় যাত্রা করিলাম।

বিদায় কালীন আমার ছোট ছেলেটি আমার জন্য আকুল স্বরে ক্রন্দন করিল। রাজ্যমাটি স্তীমার ঘাটে আসিয়া আমার বন্ধু বান্ধব সকলে বিদায় সম্বাধন জানাইল, স্তীমার ছাড়িল।

ঐ দিনই রাত্রে চট্টগ্রাম শহরে রেলওয়ে স্টেশনে ট্রেন ধরলাম। স্টেশনে হঠাৎ আমার এক সহপাঠি ডাক্তার ফজলী আহাম্মদের সাথে দেখা হয়। আলাপ করিয়া জানিলাম তিনিও আমার পথের পথিক। তাঁহাকে সঙ্গীরূপে পাইয়া আমার ভয় বিকম্পিত চিন্তে অনেকটা জোর আসিল। দুইজনে একই কামরায় বসিয়া সামরিক বিদ্যা শিক্ষার্থে লক্ষ্মৌ অভিমুখে রওনা হইলাম। ট্রেন চলিল। ক্রমে ক্রমে বাঙ্গালা বিহার প্রদেশ ছাড়িয়া যুক্ত প্রদেশে প্রবেশ করিলাম, পথে পাটনা, এলাহাবাদ, বারানসী ইত্যাদি শহর অতিক্রম নূতন জায়গা দর্শন করিতে করিতে মনে অনেকটা অভিনব আনন্দের সঞ্চার হইল। দুই বন্ধুতে মিলিয়া বেশ আমোদ প্রমোদের মধ্যে এই সুদীর্ঘ Train journey অতিক্রম করিলাম। ট্রেনে চলার পথে মনে মনে ভাবিয়াছিলাম ছাত্র জীবনে ভারতের মানচিত্র, পৃথিবীর মানচিত্র ও বিভিন্ন দেশের অধিবাসী সম্বন্ধে কত কথাই না পড়িয়াছিলাম। কিন্তু প্রত্যক্ষ দর্শনের ত সুযোগ ঘটে নাই, এবার বুঝি এই সামরিক জীবনের দৌলতে সেই সুযোগ আসিয়া পরিল।

সামরিক জীবন

লক্ষ্মৌ শহর, ১৯৪১ ইংরাজী ২৯শে জানুয়ারী সন্ধ্যা প্রায় ৭ টার সময় এই শহরের স্টেশনে প্রবেশ করিয়া ট্রেন থামিল। ট্রেন হইতে অবতরণ করিলাম। আমাদের Military Cantonment শহরের কোন অংশে অবস্থিত জানিতাম না। এক ঘোড়া গাড়ীওয়ালাকে ডাকিলাম, কিন্তু গাড়ীওয়ালার সাথে আলাপ করিতে যাইয়া আর এক মহা বিপদে ঠেকিলাম। ইতি পূর্বে কোন দিন আমার বাঙ্গালা দেশের বাহিরে ভ্রমণ করার সৌভাগ্য হয় নাই। অতএব হিন্দুস্থানী লোকের সাথে আলাপ করা আমার কোন সুযোগ হয় নাই বলিলেও চলে। কাজেই ঐ সময় আমার হিন্দুস্থানী ভাষা সম্বন্ধে যে কতদূর জ্ঞান ছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। গাড়ীওয়াল হিন্দিতে কি বলিল কিছুই বুঝিলাম না এবং আমিও যে তাহাকে কি বলিতেছি সেও বোধ হয় মাথামুন্ড কিছুই বুঝিলাম না। ঐ সময়ে আমি যে গারোয়ানের সহিত কি রকম হিন্দি বলিয়া ছিলাম তাহা এক মাত্র ভগবানই জানেন। আমার বন্ধু ডাক্তার আহাম্মদ আমার চেয়ে অনেকটা ভাল হিন্দি

বলিল এবং সে কোন রকমে ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিল যে “তুমি আমাদের মিলিটারী কেন্টনমেন্ট দুই নম্বর কোম্পানীতে লইয়া যাও।” যাই হউক, আমরা রাত্র প্রায় সাড়ে আটটার সময় কোন প্রকারে নির্দিষ্ট স্থানে আসিয়া পৌঁছিলাম। গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়াই এক মিলিটারী সসন্ত্র প্রহরী আসিয়া আমাদের Challenge করিল; এবং বলিল “আপ্ লোক্ নয়া রিক্রুট আয়া?” আমরা জবাব দিলাম “হাঁ”। তারপর সে বলিল “আচ্ছা আয়ে, অন্দর চলিয়ে” এই বলিয়া সে আমাদের এক ব্যারাকের ভিতর লইয়া গেল। ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম আমার পরিচিত অনেক ডাক্তার বন্ধু একত্রে বসিয়া গল্প গুজব করিতে ছিলেন। হঠাৎ আমাদের দেখিয়া তাহারাও খুব খুশী হইলেন এবং আসুন আসুন বলিয়া সাদরে অভ্যর্থনা জানাইলেন। আমরাও তাঁহাদের পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম।

তারপর দিন লক্ষ্মৌ শহর পরিভ্রমণ করিলাম। ইহা একটি ইতিহাস প্রসিদ্ধ জায়গা। ইতিহাসে কতবার এই শহরের কথা পড়িয়াছিলাম কিন্তু স্বচক্ষে দর্শন লাভের সুযোগ হয় নাই। অতএব এই নূতন জায়গা দর্শন করিয়া মনে এক অভিনব আনন্দের সঞ্চারণ হইল। এই শহরে এখনও প্রাচীন কালের নানা কীর্তির ভগ্নাবশেষ বিরাজমান। এখানে প্রাচীনকালের মুসলমান নবাব কর্তৃক নির্মিত কয়েকটি প্রকাণ্ড প্রাসাদ আছে। প্রাচীনকালের মসজিদ ইমামবরা কুঠি একটি দর্শনীয় জিনিষ। আমাদের Military Cantonment টি এই শহরের এক প্রান্তে অবস্থিত। ইহার আয়তনও অনেক বড়।

১৯৪১ ইংরেজীর ১লা (প্রথম) ফেব্রুয়ারী তারিখ হইতে আমার প্রকৃত সৈনিক জীবন আরম্ভ হয়। আমার সামরিক জীবনের প্রত্যেক ঘটনা লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয়। অতএব অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি মাত্র। আশাকরি পাঠক ইহাতে কিছু অন্যথা মনে করিবেন না।

অদ্য তারিখে আমি আমার সাধারণ অসাময়িক পোষাক পরিত্যাগ করিয়া সামরিক সজ্জায় সজ্জিত হইলাম। আমাদের সামরিক শিক্ষা দেওয়ার জন্য একজন কোমাউণী জাতীর হাবিলদার নিযুক্ত ছিলেন। তিনি আমাদের সামরিক পোষাক কি প্রকারে পরিধান করিতে হয় শিখাইয়া দিলেন। মাথায় লৌহার টুপী, গায়ে খাকী সার্ট, পরনে খাকী হাফ্ পেণ্ট, কোমরে প্রায় দুই ইঞ্চি পরিমাণ মোটা চাম্রার পেটি, পায়ে কাল রং এর বুট ও পট্টি। পিঠে ঝোলা এবং পাশে ঝুলান অবস্থায় বিষাক্ত গ্যাস হইতে আত্মরক্ষা

করিবার জন্য একটি মুখোস (Respirator) এবং হাতে একটি রিভলবার (Revolver) ইত্যাদি ইত্যাদি। আজ এই অদ্ভুত রকমের এক নব পরিচ্ছেদে সজ্জিত হইয়া মনে যেন কি রকম এক ভাবের সঞ্চার হইল। এই বুঝি জীবনের আর এক নূতন রঙ্গ মঞ্চে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখি ইহার গতি কত দূর।

আমাদের প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করিয়া মলমুখে পরিত্যাগ করার পর এক গ্লাস গরম চা এর সাথে দুই খানা পুরী (আটা রুটি) উদরস্থ করিয়া সকালে ঠিক ৭টার সময় প্যারেড্‌ গাউন্ডে (Parade-ground) হাজির হইতে হইত। ঐ সময় আমাদের পূর্ণ সামরিক সজ্জায় সজ্জিত হইতে হইত। আমাদের ট্রেনিং মাষ্টার (ঐ হাবিলদার সাহেব) এক প্রকান্ড চিৎকার করিয়া বলিত “Squad fall in” ঐ ডাকের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সকলের এক সারিতে প্যারেড্‌ এ হাজির হইতে হইত।

ঐ Parade আমাদের ক্রমান্বয়ে ১২ টা পর্য্যন্ত চলিত। তারপর খাওয়ার জন্য এক ঘন্টা বিশ্রাম পাইতাম এবং খাওয়ার পর পুনঃ দেড়টা, দুই টা হইতে বৈকাল ৫টা পাঁচটা পর্য্যন্ত অন্যান্য বিষয়ে ক্লাস হইত। ঐ Cantonment এ হাজার হাজার শিক্ষার্থী এই রকম ভাবে শিক্ষা গ্রহণ করিত। এখানে শুধু ডাক্তারদের জন্য Training Centre নয়। এখানে মিলিটারী সকল রকমের Training দেওয়া হয়। যাহাদের শিক্ষা সমাপ্ত হইতেছে তাহাদের ভারতের বাহিরে যেমন আফ্রিকা, ইউরোপ, মেসোপোটামিয়া সিংগাপুর, মালয় ইত্যাদি জায়গায় পাঠান হইতেছিল। ঐ সময় ইউরোপ ও আফ্রিকায় তুমুল সংগ্রাম চলিতেছিল। আমাদের মনেও এই ভয় হইতেছিল যে কখন আমাদের ট্রেনিং সমাপ্ত হইয়া রণক্ষেত্রে গমন করিতে হইবে। যাহাদের উপর হুকুম হইত তাহাদের বিনা ওজর আপত্তিতে চলিয়া যাইতে হইত।

এখানে আমাদের তিন মাস পর্য্যন্ত কঠোর সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইল। যথা কালে আমার শিক্ষা সমাপন করিয়া আমি এক সৈনিক দলে ডাক্তার হিসাবে নিযুক্ত হইলাম। এখানে আমার দৈনন্দিন কাজের চাপ বিশেষ ছিলনা এবং ঘটনা চক্রে আমার ছাত্র জীবনের বন্ধু ডাক্তার করিমের সহিত দেখা হয়। তাহাকে সঙ্গী পাইয়া দিন বেশ আমোদে কাটিতে লাগিল। দুই বন্ধুতে আমরা লক্ষ্মৌ শহর ঘুরিয়া কোথায় কি আছে, কোথায় ভাল রসগোল্লা, কোথায় ভাল মিষ্টি পাওয়া যায় ইত্যাদি অনুসন্ধানে সময় কাটাইতাম। একদিন হঠাৎ আমার উপর সমুদ্রের অপর পারে (over seas) যাওয়ার

হুকুম হইল। দূর দেশে যাত্রা করিবার পূর্বে, যেমন মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত ব্যক্তিদের ফাঁসী কাষ্ঠে ঝুলাইবার পূর্বে একবার তাহাদের প্রিয়জনের মুখ দর্শন করিবার জন্য মিলিটারী প্রধান কর্মকর্তা কর্তৃক একমাসের অবকাশ দেওয়া হইল। বাড়ী আসিলাম এবং প্রিয় পুত্র পরিবারের মুখদর্শন করিলাম তারপর যথা কালে বাড়ী হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া সমুদ্রের পর পারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলাম।

১৯৪১ ইংরেজী ৫ই আগষ্ট, রাত্র ১০ দশটার সময় আমাদের Special Train লক্ষ্মী হইতে বোম্বে অভিমুখে রওনা হইল। ট্রেনে আমরা প্রায় দুই হাজার আরোহী ছিলাম। পথে আমাদের খাওয়ার বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। অসুস্থ সৈনিকদের চিকিৎসার্থে ট্রেনে একটি আলাদা কামরায় হাসপাতালের ব্যবস্থা হইল। ঐখানে আমার দলবল (staff) লইয়া আমি নিজ কর্তব্যে লিপ্ত হইলাম।

ট্রেন চলিল। পথে কত শহর কত গ্রাম দর্শন করিলাম। এই সকল দৃশ্যাবলী দর্শন করিতে করিতে আমরা ৮ই আগষ্ট সকাল ৭টার সময় বোম্বে বন্দরের জাহাজ ঘাটে আসিয়া পৌঁছিলাম। জাহাজ ঘাটে আসিয়া দেখিলাম আমাদের ভারতীয় সৈনিক হাজারে হাজারে পরম উল্লাসে সমুদ্রের পার পারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে। আমিও তাহাদের মধ্যে এক জন। তীর হইতে নিরীক্ষণ করিলাম পর্বত প্রমান বিরাটাকায় সারি সারি রণ তরী আমাদের প্রতীক্ষায় সমুদ্র বক্ষে ভাসিতেছে। জাহাজের উপর দাঁড়াইয়া হাজারে হাজারে সৈনিক পরম উল্লাসে গান করিতেছে কেহ বা জয়ধ্বনি দিতেছে, আর কেহ কেহ বোধ হয় বাড়ীতে প্রিয়জনের কথা স্মরণ করিয়া বিষাদ বদনে মুগ্ধমান হয়ে আছে। আর কেহ কেহ কর্মব্যস্ত হইয়া এদিক সেদিক ঘোরা ফেরা করিতেছে। জাহাজ ঘাটে দেখি বহু মেম সাহেব ও দেশীয় নৃপতিদের রানী মহারানীগন বিভিন্ন stall খুলিয়া যুদ্ধ যাত্রী সৈনিকদের বিনা পয়সায় পানীয় জল, চা, মিষ্টি, সিগারেট, পান ইত্যাদি বহু রকমের সামগ্রী বিতরণ করিতেছিল এবং অনেকেই রুমাল ঘুরাইয়া নানা আনন্দ ধ্বনি করিয়া সমুদ্রগামী সৈনিকদের উৎসাহ প্রদান করিতেছিল। আমি তৃপ্তির সহিত চা পান করিলাম। এবং মনে মনে ভাবিলাম জীবনে আমার সমুদ্র ভ্রমণ ঘটে নাই। অতএব এই বার এই বিরাট কায় রণ তৈরী দিয়া সমুদ্র ভ্রমণের সুযোগ আসিল, এই চিন্তা করিয়া মনে যেন কি এক অভিনব আনন্দের সঞ্চার হইল।

জাহাজে, ৮ই আগষ্ট ১৯৪১ ইংরেজী

জাহাজে উঠলাম। বেলা প্রায় দুইটার সময় আমাদের ডেস্পো নামক বিরাট কায় ২৭ হাজার টনের ক্ষমতাসালী (Capacity) জাহাজ মন্থর গতিতে দুলিতে দুলিতে ভারত মহাসাগরের বক্ষের উপর দিয়া কোন এক অজানা দেশের উদ্দেশ্যে দুই সহস্র সৈনিক লইয়া বীরদর্পে বোম্বে বন্দর হইতে যাত্রা করিল। জাহাজ দূর হইতে দূরে চলিল এবং ক্রমশঃ বোম্বে বন্দর ও ভারতমাতা দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া পরিল। আমি দোতলায় জাহাজের বারান্ডার উপর দাঁড়াইয়া এই অপূর্ব দৃশ্য নিরীক্ষণ করিতে ছিলাম, এমন সময় আমার মনে আর এক নতুন ভাবনার উদয় হইল। হঠাৎ একটু বাড়ীতে প্রিয়জনের কথা, দেশের কথাও বন্ধু বান্ধবের কথা মনে পরিল এবং একটু যেন অধৈর্য্য হইয়া নিমিষের মধ্যে দুই চক্ষু দিয়া দর দর করিয়া কয়েক ফোটা অশ্রু জল নামিয়া আসিল।

বুঝি, বাঁধ ভাঙ্গিল, নিজকে সামলাইয়া নেওয়ার জন্য মুহূর্তের মধ্যে ধৈর্য্য সম্বরণ করিয়া দুই চক্ষুর জল মুছিয়া ফেলিলাম এবং বাড়ীর কথা ভুলিতে চেষ্টা করিলাম কিন্তু অবোধ মন সহজে বুঝ মানিল না। এই সময় বাল্যকালে পড়া কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের এক কবিতা মনে পরিল। তিনি বিলাত যাত্রা কালে বঙ্গমাতাকে উদ্দেশ্য করে লিখেছিলেন :-

রেখো মা দাসেরে মনে,
এ মিনতি করি পদে।
সাধিতে মনের সাধ
ঘটে যদি পরমাদ
মধু হীন করো না কো
তব মন কোকন দে।

আমিও তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া চট্টলা জননী পার্শ্বত্যা ভূমির প্রতি প্রনতি জানাইয়া মনে মনে উচ্চারণ করিতে লাগিলাম যেমন :-

রেখো মা দাসের এই,
মিনতি তব চরণে।।
সাধিতে কর্তব্য মোর,
যদি ঘটে বিঘ্ন মোর,
তব হৃদি কোকন দে,
রেখে দিও এ প্রমোদে।।

এমন সময় হঠাৎ একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সাথে আলাপ হয়। আলাপ করিয়া জানিলাম তাঁহার নাম ডাক্তার নির্মলেন্দু মুন্সী। রাজশাহী জেলার অন্তর্গত বালুভড়া গ্রামে তাঁহার বাড়ী। তিনিও আমার পথের পথিক। ক্রমে আমরা ৫/৭ জন বাঙ্গালী জাহাজে একত্র হইলাম। ইহাদের মধ্যে আমার একজন অন্যতম বন্ধু মিষ্টার রবীন্দ্র নাথ মল্লিক তিনি হইলেন আমাদের সৈনিক দলের একজন করানী। আমি ডাক্তার মুন্সী ও রবীন বাবু এই তিন জনে over-seas তে সমুদ্রের পর পারে বহু দিন পর্য্যন্ত একত্রে ছিলাম এবং কতবার নিজ নিজ সুখ দুঃখের কথা আলোচনা করি এবং রণক্ষেত্রে শত্রু বোমা বর্ষিত হওয়ার সময় কতবার তিনজনে একত্রে গর্ভে প্রবেশ করিয়া শত্রু বোমা হইতে নিজকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছি। এই দুঃসময়ে কত বার আমরা পরস্পরের সুখ দুঃখের অংশগ্রহণ করিয়াছি। এ কারণে আমাদের এই তিন জনের মধ্যে বন্ধুত্ব অতীব গভীর হইয়া উঠে।

আমাদের জাহাজ দুলিতে দুলিতে কোন এক অজানা দেশের উদ্দেশ্যে অবিরাম চলিতে লাগিল। আমরা দোতলায় দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় নিজ নিজ বিছানা পত্র পাতিয়া লইলাম। আমরা এই কয়েক জন বাঙ্গালী মিলিয়া নানা গল্প গুজবে সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলাম এবং বিরহ বেদনা ক্লিষ্ট মনকে ভুলাইয়া, দেশের, বন্ধু বান্ধবদের ও প্রিয়জনের কথা ভুলিতে চেষ্টা পাইলাম। আমাদের জাহাজ কোন দেশে যাইবে তাহা জানা ছিল না; কারণ মিলিটারীতে প্রত্যেকটা বিষয় গোপনীয়। এই খবর কেবল জাহাজের Captain ও unit Commander (কমান্ডার) ছাড়া কেহ জানেনা। আমাদের মধ্যে কেহ কেহ মনে করিয়া ছিলাম “মেসোপোটামিয়ায়, কেহ সিঙ্গাপুরে এবং আফ্রিকায় যাইবে বলিয়া অনুমান করিয়া ছিলাম, কিন্তু পরে জানিতে পারিলাম আমরা আফ্রিকা মুখী যাইতেছি।

পূর্বে আমি কোন দিন সমুদ্র ভ্রমণ করি নাই, অতএব সমুদ্র ভ্রমণ সম্বন্ধে আমার কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। দেখিলাম বিশাল সমুদ্রের অনন্তঃ জলরাশি পর্বত প্রমান আকার ধারণ করিয়া তরঙ্গের পর তরঙ্গ উত্থিত হইতে লাগিল। এই অনন্ত জলরাশির মধ্য দিয়া শত শত জল তরঙ্গের সাথে যুদ্ধ করিতে করিতে আমাদের এই বিরাট কায় রণ তরী নির্ভিক চিন্তে অচল অটল ভাবে মন্তর গতিতে অবিরাম নিজ গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। ইহার অগ্র পশ্চাৎ আরও দুই খানা রণ তরী (ত্রুজার) সমর সজ্জায়

সজ্জিত হইয়া, শত্রুর গোপনীয় আক্রমণ নিরীক্ষণ করিতে করিতে প্রহরীর ন্যায় বীর দর্পে চলিতে লাগিল। হঠাৎ শত্রুর সম্মুখীন হইলে এই দুই জাহাজ আমাদের রক্ষা করিবে। আমি সমুদ্রের এই অপূর্ব দৃশ্য নিরীক্ষণ করিয়া নয়ন রঞ্জন করিতে লাগিলাম।

আরোহীদের মধ্যে অনেকে সামুদ্রিক ব্যাধিতে (seasickness) আক্রান্ত হইয়া বমি করিতে লাগিল এবং শয্যাশায়ী হইয়া পরিল। যাহারা সমুদ্র ভ্রমণে অনভ্যস্ত তাহারা সাধারণতঃ এই ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। সৌভাগ্য ক্রমে আমি এই ব্যাধি হইতে অব্যাহতি পাইলাম। মাত্র এক দিন সাধারণ ভাবে কিছু মাথা বেদনা অনুভব করিয়া ছিলাম।

জাহাজে উঠিয়া প্রথমেই প্রত্যেককে আমাদের একটি করিয়া Life jacket (জলে ভাসমান বস্তু) দেওয়া হইল। এই jacket টি অতীব হালকা এবং জলে কখনও ডুবে না। ইহা বালিশের আকারে তৈরী, ইহা বুকে লইয়া এক জন লোক কয়েক দিন পর্যন্ত সমুদ্রের জলে ভাসিয়া থাকিতে পারে। উদ্দেশ্য যদি দৈবাৎ কোন বিপদ ঘটে তাহা হইলে ইহাকে আশ্রয় করিয়া যেন কিছুক্ষণ জলে বাঁচিতে পারা যায়। এই jacket আমাদের সব সময় বুকে বাঁধিয়া রাখার হুকুম হইল এবং যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে তাহা হইলে আমাদের কি প্রকারে আত্মরক্ষা করিতে হইবে ইত্যাদি বিষয়ে জাহাজের উপর আমাদের উপদেশ দেওয়া হইল। মাঝে মাঝে জাহাজের উপর বিমান আক্রমণের সংকেত ধ্বনী করা হইত এবং ঐ সময় আমরা সকলে ডেকের উপর শ্রেণী বদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া কি প্রকারে নিজকে বাঁচাইতে হইবে এবং কি প্রকারে বিপদের সময় রোগীদের স্থানান্তরিত করিতে হইবে এবং কি প্রকারে আরোহীরা জাহাজ হইতে অবতরণ করিবে ইত্যাদি বিষয়ে Practice করিতাম। জাহাজে আমি রোগীদের চিকিৎসার্থে হাসপাতালের কাজে নিযুক্ত হইলাম।

আমাদের জাহাজ দিবা রাত্র চলিতে লাগিল এবং ক্রমে ভারত মহাসাগর অতিক্রম করিয়া আরব সাগরে প্রবেশ করিল। সপ্তম দিবসে অতি প্রত্যুষে বিছানা হইতে উঠিয়া জানালার ভিতর দিয়া জাহাজ হইতে প্রায় ২/৩ মাইল দূরে অস্পষ্ট ভাবে তীরের ন্যায় শুকনো বালুকা ভূমি দেখিতে পাইলাম। অনেক দিন পরে হঠাৎ তীর ভূমি দেখিয়া মনে আর আনন্দের সীমা রহিল না। তারপর আরোহীদের মধ্যে অনেকে বলিতে লাগিল “ঐ এডেন বন্দরে আসিলাম” ঐ বন্দর, ঐ জাহাজ ঐ লোক জন দেখা যাইতেছে ইত্যাদি ইত্যাদি। আরোহীরা সকলে আনন্দে মগ্ন হইয়া কোলাহল করিতে লাগিল। ক্রমে

জাহাজ ভোর ৭ টার সময় এডেন বন্দরে আসিয়া তীরে লাগিল। অনেক দিন পরে তীর দেখিয়া আরোহীদের মধ্যেও আর আনন্দ ধরে না।

এডেন বন্দরের কথা ছাত্র জীবনে বই এ পড়িয়া ছিলাম কিন্তু স্বচক্ষে দেখার সুযোগ হয় নাই; অতএব এইবার সেই সুযোগ মিলিল। ইহা এডেন উপসাগরের তীরে আরব দেশের একটি সামুদ্রিক বন্দর। শহরটি ছোট, এখানে উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছুই নাই, ইহা কেবল জাহাজ ঘাটের জন্য প্রসিদ্ধ। শহরের চারি ধারে কেবল ধু ধু বালুকা রাশি, মরু ভূমি। জীবনে প্রথম এখানেই মরুভূমির সাথে আমার সাক্ষাৎ। এই বন্দরে আমাদের পথ ক্লান্ত জাহাজ ছয় দিন পর্যন্ত বিশ্রাম করিল। আমাদের জাহাজ তীরে লাগার সঙ্গে সঙ্গে ঐ দেশীয় কয়েক জন লোক ছোট ছোট নৌকাতে আসিয়া বিরাট কয়েকটা সামুদ্রিক মাছ বিক্রি করিতে আনিল। আমাদের কয়েকজন আরোহি একটা বিরাট মাছ ক্রয় করিয়া আনন্দে ভক্ষণ করিল।

বিশ্রাম অন্তে সপ্তম দিবসে প্রাতে ৮ টার সময় আমাদের জাহাজ রণসজ্জায় সজ্জিত হইয়া পুনঃ দুলিতে দুলিতে শত শত পর্বত প্রমাণ জল তরঙ্গের সাথে যুদ্ধ করিতে করিতে মস্তুর গতিতে লৌহিত সাগরের বক্ষের উপর দিয়া নিজ গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। জাহাজের উপর প্রকান্ত কামান সারি বদ্ধ ভাবে সুরক্ষিত হইল এবং আরও বহু প্রকারের সমর সজ্জা সুন্দর ভাবে সাজান হইল। এই বার আমাদের বিশাল রণতরী বীর দর্পে চলিতে লাগিল। আরোহিরা লৌহিত সাগরের অপূর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্য নিরক্ষণ করিতে করিতে বিমুগ্ধ হইয়া পরিল। কথিত ছিল ঐ সময় শত্রুর ডুবো জাহাজের (Sub marine) আক্রমণ অত্যন্ত ভয়াবহ ছিল। সেইজন্য এত রণসজ্জা যখন সাগর অতিক্রম করিতেছিলাম।

ক্রমে আমাদের জাহাজ অষ্টাদশ দিবসে (২৬শে আগষ্ট ১৯৪১ ইংরেজী) বেলা প্রায় তিনটার সময় নিরাপদে তাহার গন্তব্য স্থান সুয়েজ বন্দরে আসিয়া পৌছিল। এইবার সুদীর্ঘ আঠার দিন ব্যাপী সমুদ্র ভ্রমণে ক্লান্ত আরোহিরা এক স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া জাহাজ হইতে অবতরণ করিল। কূলে উঠিয়া দেখিলাম “সমুদ্র তীরে একটি বিরাট প্রস্তর স্তম্ভ নির্মিত আছে।” উহাতে লেখা আছে যে সব ভারতীয় সৈনিক গত ১৯১৪ ইংরেজীর প্রথম মহাসমরে এদেশে আসিয়া প্রাণ বিসর্জন করিয়াছিলেন তাঁহাদের স্মৃতি চিহ্ন স্বরূপ এই স্তম্ভটি নির্মিত হইয়াছে। অতএব মনে মনে ভাবিলাম

এই বার বুঝি আমাদের স্বত্বের জন্য আর একটি স্তম্ভ নির্মিত হইবে। যেহেতু আমরাও এই দেশে প্রাণ বিসর্জন করিতে আসিয়াছি। অবশ্য ইহা ইংরেজী ও আরবিক ভাষায় লিখিত ছিল।

জাহাজ ঘাটে আরও দেখিলাম কয়েকখানা বিরাটকায় রণতরী যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন দিয়া অর্ধ দক্ষ অবস্থায় অর্ধ জল মগ্ন হইয়া আছে। তত্ত্ব লইয়া জানিলাম শত্রু বোমায় ঘায়েল হয়ে তাহাদের এই রকম অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। আমরা জাহাজ হইতে অবতরণ করিয়া পদ ব্রজে (March করিয়া) সুয়েজ বন্দর হইতে প্রায় পাঁচ মাইল ভিতরে এক কেম্পে চলিয়া গেলাম।

মিশোর দেশ (Egypt)

আফ্রিকা মহাদেশের উত্তর পূর্ব এক অংশকে মিশোর বা ইজিপ্ট বলা হয়। এই রাজ্যের অন্তর্গত লৌহিত সাগরের উপকূলে সুয়েজ বন্দর অবস্থিত। আমরা এই বন্দরে অবতরণ করি। ইহা একটি সামুদ্রিক বন্দর, আমরা বন্দরের অনতি দূরে এক কেম্পে আসিয়া আশ্রয় নিলাম। কেম্প পৌছিতে রাত্র প্রায় ৯টা বাজে। সেই রাত্রে আর খাওয়া দাওয়ার কোন ব্যবস্থা হইয়া উঠিল না। আমার সেই বাঙ্গালী বন্ধু রবীন বাবুর খোলা হইতে রাত্রে রাস্তা হাঁটিতে হাঁটিতে একখানা রুটী লইয়া জল সংযোগে চিবাইতে চিবাইতে অতি কষ্টে উদরস্থ করিয়া শুকনো জঠরা অগ্নির কিছু প্রশমিত করিলাম। এবং কেম্পে পৌছিয়া ভূমি শয্যা গ্রহণ করিয়া পথ ক্লান্ত শরীর নিদ্রা দেবীর কোলে আশ্রয় নিলাম। আমাদের দলের অন্যান্য লোকেরাও যে যেখানে পারিল ভূমি শয্যা গ্রহণ করিয়া নিদ্রা দেবীর আশ্রয় নিল।

রাত্র প্রভাত হইল। সকালে উঠিয়া দেখি আমরা এক বিরাট মরুভূমির মাঝখানে। চারিদিকে কেবল ধূ-ধূ বালুকা রাশি এবং মরুভূমির স্থানে স্থানে সৈনিক শিবির দৃষ্টি গোচর হইতে ছিল। কর্তব্যবস্ত সৈনিকগণ সারা দিন কেবল কর্তব্যরত থাকিয়া এদিক সেদিক ছুটাছুটি করিতেছিল। আমাদের শিবিরেও তাহা খাটাইয়া যথোচিত ভাবে সাজান হইল। সৈনিক শিবিরে পরিভ্রমণ করিয়া দেখিলাম নানা স্থানে রকমারী সাজ সজ্জা। কোথাও কামান বসান, কোথাও বোমা স্তূপিকৃত কোথাও হাসপাতাল, কোথাও

পেট্রোলের টেক এবং কোথাও অজ্ঞাগার অবস্থিত ইত্যাদি। সুয়েজ শহর পরিভ্রমণ করিয়া দেখিলাম কত বড় বড় অট্টালিকা বোমার আঘাতে ঘায়েল হয়ে ধুলিস্বাৎ হইয়া আছে। ঐ সময় কত লোক যে প্রাণ হারািয়াছে তার অন্ত নাই।

দ্বিতীয় দিবসে নৈশ ভোজন সমাপ্ত করিয়া রাত্র প্রায় ১০টার সময় তাম্বুর নীচে শুইয়া পরিয়াছি। আমার দক্ষিণ পার্শ্বে মিষ্টার মল্লিকের বিছানা। রাত্র প্রায় ১১টার সময় তন্দ্রায় প্রায় অভিভূত ঠিক এমন সময় হঠাৎ এক সারেন্সর বিকট ধ্বনি (alarm) বাজিয়া উঠিল, ইহাতে হঠাৎ আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। জীবনে কোন দিন এই রকম সাংকেতিক ধ্বনির সাথে পরিচিত ছিলাম না। অতএব আকস্মিক এই রকম এক অদ্ভুত শব্দ শুনিয়া ইহার তাৎপর্য্য কিছুই বুঝিলাম না এবং আতঙ্কে পায়ের নখ হইতে মাথার চুল পর্যন্ত কম্পিত হইয়া উঠিল। তারপর শুনিতে পাইলাম আমাদের ইউনিটের কমান্ডার সাহেব উচ্চ স্বরে চিৎকার করিয়া আমাদের সকলকে সাবধান করিয়া দিতে লাগিলেন। দুসমন আয়া, দুসমন আয়া, আভি বোমা গিরেগা, সব আদমিও জমিন কা উপর লেট যাও, লেট যাও ইত্যাদি বলিয়া হিন্দিতে সাহেব (ইনি একজন European Major) উচ্চস্বরে চিৎকার করিতে লাগিলেন। তারপর বুঝিলাম শত্রু এসেছে এবং এক্ষুণে আমাদের উপরবোমা বর্ষন করিবে। অতএব আকস্মিক আতঙ্কে কাঁপিতে কাঁপিতে অর্ধ মৃত বৎ অবস্থায় ভূমি শয্যা গ্রহণ করিলাম। আমার দক্ষিণ পার্শ্বে আমার বন্ধু রবীন বাবুও শুইয়া পরিলেন এবং আমাদের দলের অন্যান্য সকলেই স্ব স্ব স্থানে ভূমির উপর চিৎ হইয়া শুইয়া পরিল। দেখিতে দেখিতে ১০/১৫ মিনিটের মধ্যে তুমুল গর্জনের সহিত ভীম বেগে আমাদের মাথার উপর বিমান যুদ্ধ আরম্ভ হইল। চতুর্দিকে গুরুম গুরুম রবে বিমান ধ্বংসী কামানের গর্জনে পৃথিবী প্রায় কম্পমান হইয়া উঠিল।

বিমান ধ্বংসী কামানের গুলিতে, বিমানের আলোতে ও নিষ্কিণ্ড বোমার বিচিত্র আলোক ছটায় সমস্ত আকাশ আলোময় হইয়া উঠিল। বিদ্যুতালোক যেমন ক্ষণিকের জন্য সমস্ত পৃথিবীকে অন্ধকার রাখে আলোকিত করিয়া তুলে ঠিক তদ্রূপ বিমান হইতে নিষ্কিণ্ড আলো ও বিস্ফোরিত বোমার আলো আমাদের মাথায় উপর সমস্ত আকাশটাকে আলোময় করিয়া তুলিতে লাগিল। এই বিমান যুদ্ধ ক্রমাগত অন্ততঃ ৪ ঘন্টা পর্যন্ত ভীষণ ভাবে চলিল। এই সময় আমরা জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া মৃ্যমান অবস্থায় ভূমির উপর শুইয়া রহিলাম। এক এক বার বোমা বিস্ফোরনের শব্দে ও বিমান ধ্বংসী

কামানের বিকট শব্দে কর্ণ কুহর ছিড়িয়া যাওয়া উপক্রম হইয়া উঠিল এবং সর্ব শরীর যেন অবশ হইয়া আসিল। মনে হয় ঐ সময় সংজ্ঞাহীন হইয়া পরিয়াছিলাম। যখনই একটু চেতনা আসিল তখন কাতর স্বরে ভগবান যুদ্ধের নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলাম। হে ভগবান এই যাত্রা রক্ষা করো, এ ভাবে মাতাঠাকুরানীর উপদেশানুযায়ী দ্বিরত্ন বন্দনা করিতে লাগিলাম। জীবনে এই প্রথম আর একটি নুতন পর্যায়ে উপস্থিত হইলাম। মনে মনে ভাবিতেছি “জীবন পন করিয়া যুদ্ধে যোগদান করিয়াছি অতএব এই ভয় করিলে চলিবেন।”

প্রায় ৪ ঘন্টা পরে শত্রু বিমান পলায়ন করিল, এবং ক্রমে ক্রমে কামানের শব্দও নীরব হইয়া আসিল, এই বার আমি আশ্বে আশ্বে এক স্বস্থির দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া অনুচ্চ স্বরে রবীন বাবুকে ডাকিলাম। রবীন বাবু বেঁচে আছেন তো? জবাব পাইলাম “আছি” বলিলাম ‘আমাদের জীবনের ভরসা আর নাই’ রাত্র প্রভাত হইলে আমাদের পরস্পরকে পরস্পরের বাড়ীর ঠিকানা দিতে হইবে, যদি দুই জনের মধ্যে একজন বেঁচে থাকি তাহা হইলে আমাদের বাড়ীতে অন্ততঃ খবরটা পাঠাইতে যেন ভুল না হয়। রবীন বাবু জবাব দিলেন “আচ্ছা” তাই হইবে। যাহা হউক ভগবান দয়া পরবশ হয়ে এ যাত্রা আমাদের সকলকে রক্ষা করিলেন।

ভোরে উঠিয়া জানিতে পারিলাম “ইহা ছিল ইটালীয় বিমান আক্রমণ। ঐ রাত্রে তাহারা নানা স্থানে বোমা বর্ষন করিয়াছিল বটে কিন্তু বিশেষ কোন সাফল্য মন্ডিত হয় নাই। কেবল দুই এক জায়গায় বোমা নিক্ষিপ্ত করিয়া ১/২ টা পেট্রোল ট্যাক (Tank) জ্বলাইয়া দিয়াছিল মাত্র।

তাহাদের (Main Target) লক্ষ্য ছিল আমরা যেই জাহাজ হইতে অবতরণ করিয়াছি ঐ জাহাজটাকে ধ্বংস করা; কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারে নাই।

এই শিবিরে আমাকে প্রায় ৫ মাস কাল অবস্থান করিতে হইল। এই পাঁচ মাস আমাদের প্রায়ই বিমান যুদ্ধের ভিতর দিয়া অবস্থান করিতে হইল। সন্ধ্যার পূর্বে আহাতি করিয়া বিমান আক্রমণের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য আমাদের গর্ভের (Trench) ভিতর যাইয়া বসিয়া থাকিতে হইত। মাথায় লৌহার টুপি, মুখে গ্যাস মাস্ক (gas-mask), গায়ে Great coat পরিহিত অবস্থায় আমাদের প্রচণ্ড শীতে ঐ গর্ভের ভিতর বসিয়া থাকিতে হইত। এই অবস্থায় যে কত রাত্র কাটাইতে

হইয়াছিল তাহার অন্ত নাই। ক্রমশঃ আতঙ্ক অনেকট দূরীভূত হইল। বরং পরে বিমান আক্রমণ একটা আমোদের বস্তু বলিয়া মনে হইত। এত বিপদের মধ্য দিয়া জীবন অতিবাহত হইলেও কোন দিন পত্রে এই সবার উল্লেখ করিয়া বাড়ীতে জানাইতে পারি নাই, কারণ সামরিক আইন অনুসারে এই সব সংবাদ বাড়ীতে জানান নিষিদ্ধ ছিল। বাড়ীতে সব সময় লিখিয়াছিলাম “আমি সুখে ও নিরাপদে আছি।”

পরে এই শিবির পরিত্যাগ করিয়া ক্যাশসীন নামক আর এক নূতন শিবিরে চলিয়া গেলাম। এই শিবির এক ঘোর মরুভূমির মাঝখানে অবস্থিত। এই শিবিরে আমাদের সৈনিকগণ পুনরায় তিন মাস পর্যন্ত যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা করিল। তারপর আমরা এখান থেকে বদলী হইয়া “কাটারা” নামক আর এক নূতন শিবিরে চলিয়া গেলাম। এই জায়গাটি সুয়েজ নালার ধারে অবস্থিত। এই সুয়েজ নালার কথা ছাত্র জীবনে ভূগোল পাঠ করিবার সময় কাল্পনিক ভাবে জানিয়াছিলাম। কিন্তু এখন এই নালা (Suez Canal) প্রত্যক্ষ দর্শনের সুযোগ হইল। ইহা একটি পাকা ড্রেন (Cemented Drain) ইহা ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে এক ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার (French Engineer) কর্তৃক নির্মিত হয়। এই নালা ভূমোধ্যসাগর ও লৌহিত সাগরকে যোগ করিয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য ১৮৫ কিলোমিটার অর্থাৎ ১২৫ মাইল। গভীর ৫০ ফুট, তলা ১৫০ ফিট চওড়া।

ইহার এক মাথায় অর্থাৎ ভূমোধ্যসাগরের দিকে পোর্ট সুয়েজ (Port Suez) বন্দর ও অপর প্রান্তে লৌহিত সাগরের দিকে সুয়েজ (Suez) বন্দর অবস্থিত এবং এই নালার মধ্য ভাগে “ইস্মালীয়া” নামক আর এক শহর অবস্থিত।

এই কাটারা শিবিরে দুই মাস অবস্থান করার পর ইস্মালীয়া শহরের অন্তর্গত সেন্ট-ভিন্সেন্ট কেম্প নামক এক শিবিরে বদলী হইয়া আসিলাম। এই শিবিরে তিন মাস থাকার পর আমরা টুরা কেভস (Tura-Caves) নামক আর এক নূতন শিবিরে চলিয়া যাই। ইহা কাইরো মহানগরী (Cairo City) হইতে ২২ মাইল দূরে, ইহার তাৎপর্য্য এই যে এখানে একটা অতি উচ্চ পর্বত আছে। এই পর্বতের মাঝখানে অতি প্রকাণ্ড গুহা আছে। এই গুহা গুলি এত প্রকাণ্ড যে এই গুহার ভিতর একটা ছোট খাটো শহর নির্মান করা হইয়াছে। এই গুহার ভিতর হাসপাতাল, অস্ত্রাগার, খাদ্য ভান্ডার (Ration store) বোমা ও মোটর গাড়ীর কারখানা ইত্যাদি কত কি আছে তার তার অন্ত নাই। দূর হইতে নিরীক্ষণ করিলে একটা বিশাল পর্বত ছাড়া আর কিছুই

প্রতীক্ষমান হয় না, অথচ ঐ পর্বত গুহায় প্রবেশ করিলে একটা শহর বলিয়া মনে হয় । পাকা রাস্তার উপর দিয়ে মিলিটেরী যানবাহন চলাফেরা করিতেছে । এই পর্বতের উপর কত শত্রু বোমা বর্ষিত হইয়াছিল তার অন্ত নাই । কিন্তু সেই বিশাল কায় পর্বত শত শত বোমার আঘাতেও বিন্দু মাত্র বিচলিত হয় নাই । বোমার আক্রমণের সময় আমরা হাজারে হাজারে সৈনিক এই গুহায় প্রবেশ করিয়া আত্মরক্ষা করিতাম । এই শিবিরে আমাদের সৈনিক দল (unit) ছয় মাস পর্যন্ত অবস্থান করিল । এই সময় লিবিয়া মরুভূমিতে তুমুল সংগ্রাম চলিতেছিল । আমাদের অনেক সৈন্য শত্রু হাতে বন্দী হয় এবং অনেকে সময় ক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন করে । ১৯৪২ ইংরেজীর মধ্য ভাগে জার্মান সৈন্য বিজয় উল্লাসে, তীব্র বেগে কাইরো (Cairo) নগরীর দিকে অগ্রসর হইতেছিল । ঐ সময় আমাদের অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়া উঠে । আমরা প্রায় চতুর্দিকে শত্রু দ্বারা পরিবেষ্টিত হইলাম । আমাদের পলায়নের জন্য পোর্ট সুদান ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন স্থান ছিল না । এ সময় আমি এক Commando unit এ ডাক্তার নিযুক্ত হইয়া শত্রুর অগ্রগতি অবরোধ করিবার জন্য আদেশ পাইলাম, স্থল যুদ্ধে এই Commando unit অত্যন্ত বিপদ জনক । আকস্মিক ভাবে এই আদেশ পাইয়া মনে হইল যেন আমার মাথার উপর বজ্রপাত হইল । সামরিক আদেশ, অতএব আর কোন উপায় নাই, ঐ দলের সঙ্গে শত্রুর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম । দিবা রাত্র পদব্রজে ঘোর মরুভূমির মধ্য দিয়া অগ্রসর হইলাম । এই রকম ভাবে আলেক্সেন্দ্রিয়া (Alexandria) শহরের নিকটবর্তী কোন এক জায়গায় আসিয়া শত্রুর প্রায় সম্মুখীন হইয়া পরিলাম । অবস্থা অতীব গুরুতর । কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে এমন সময় হঠাৎ আর এক আদেশ পাইলাম । এই আদেশে আমাদের পূর্বের জায়গায় ফিরিয়া যাইতে হইবে । অতএব আমরা পুনঃ টুরা শিবিরে ফিরিয়া আসিলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে সংবাদ আসিল ‘শত্রুর গতি অবরোধ করা হইয়াছে এবং শত্রুকে পরাজিত করিয়া ব্যাংগাজী শহর (Bengazi) পুনঃ অধিকৃত হইয়াছে । এই বার শত্রু পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল এবং আমাদের সৈন্যেরাও পর পর আল্ আলামিন, বেংগাজী, টিউনিসিয়া, ত্রিপোলী ইত্যাদি জায়গা দখল করিতে আরম্ভ করিল এবং শত্রু ক্রমশঃ পশ্চাদ্ধাবন করিতে লাগিল ।

ইতিমধ্যে আমরা টুরা শিবির পরিত্যাগ করিয়া কাইরো নগরীর অন্তর্গত আক্বাসীয়া নামক স্থানে চলিয়া আসিলাম । এই শিবিরে অবস্থান কালে এক বার ভীষন

ভাবে শত্রুর বিমান আক্রমণে আক্রান্ত হই। ইহা ছিল জার্মান সেনাপতি (German General Romel) রোম্যালের প্রচণ্ড বিমান আক্রমণ যাহা আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত স্মরণ থাকিবে। ঐ আক্রমণের সময় আমি নিজের Trench (গর্ত) এর ভিতর একটি প্রায় তিন ইঞ্চি পুরু তক্তার নীচে উপর হয়ে মাটির উপর শুইয়া ছিলাম। Direct hit হইলে আমি নিঃশিষ্ট হইয়া যাইব, যদি Indirect hit হয় তাহা হইলে এই তক্তা আমাকে কিছুটা রক্ষা করিতে পারিবে এই ভরসা নিয়ে। জার্মান আক্রমণ কারী বিমানের তিনটি বিশেষত্ব আছে, যেমন ইহা অতি উচ্চে উড়ে, শব্দ কম হয় ও অতি দ্রুতগামী। Dive Bombing করিতে পটু। ঐ আক্রমণে আমাদের শিবিরের নিকটবর্তী বিমান বন্দর নিঃশিষ্ট হইল। আমাদের Camp বোমার টুকরায় (Splinter) ভর্ষি হইল। রাত্র ১০টা হইতে সকাল ৭টা পর্যন্ত ঐ আক্রমণ চলিল। সেই রাত্র অর্ধ মৃত বৎ অবস্থায় কাটাইলাম। সকাল হইল, শত্রু চলিয়া গেল।

এবার ও সুনিশ্চিত মৃত্যুর করাল কবল হইতে অব্যাহতি পাইলাম সেই সর্ব মঙ্গলময় ভগবানের অনন্তঃ করুণায়। সৈনিকদের মনোরঞ্জন্যের জন্য প্রায় প্রতি রাত্রে একটা কিছু আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা থাকে যেমন Open Cinema, Dancing, Concert party, Cavaret, Music ইত্যাদি। ঐ রাত্রে Open Cinema দেখার সময় অতর্কিত ভাবে উপরোক্ত বিমান আক্রমণে আক্রান্ত হইয়া পরিয়াছিলাম।

যাই হউক, ঐ রকম ভাবে মিশরের নানাস্থানে ঘুরিয়া প্রায় দেড় বৎসর কাল অতিবাহিত করিলাম। এ সময়ে এদেশের যাবতীয় দর্শনীয় স্থান গুলি দেখিবারও সুযোগ ঘটিল। এবং এ দেশের জলবায়ু (Climate) আমাদের দেশের সম্পূর্ণ বিপরিত। গ্রীষ্মকালে অত্যধিক গরম এবং শীত কালে ও অত্যধিক ঠাণ্ডা। কিন্তু ভগবানের কি বিচার বুঝি না, আমাদের দেশের এমন সুলভ বৃষ্টি হইতে এ দেশ চির বঞ্চিত। এ দেশে আমার দেড় বৎসর অবস্থিতি কালের মধ্যে আমি মাত্র খুব সাধারণ ভাবে ১০/১৫ বার বৃষ্টি পাত হইতে দেখিয়াছি এবং মনে হয় এসব বৃষ্টি একত্র করিলে ও যাহা আমাদের দেশে রীতিমত এক পশলা বৃষ্টি পাতের সমান হয় না। আমাদের দেশে ঐ রকম এক বৎসর অনাবৃষ্টি হইলে চাষ বাস বন্ধ থাকিয়া দেশময় হাহাকার পড়িয়া যাইত এবং দেশে দুর্ভিক্ষ হইয়া লোকে অনাহারে মৃত্যু বরণ করিত। কিন্তু এদেশ বাসীর অবস্থা তাই কি? না তাই নহে। এদেশ যদিও বৃষ্টি পাত হইতে চির বঞ্চিত তথাপি এ দেশে কৃষি কার্য

যথেষ্ট উন্নত এবং দেশবাসী দুর্ভিক্ষ কাহাকে বলে জানে না এবং অনাহারে মৃত্যু বরণ করে না। কাজেই স্বীকার করিতে হইবে আমরা সম্পূর্ণ প্রকৃতির উপর নির্ভর করিয়া বাঁচি। আর এ দেশ বাসী? যাহারা আজীবন সুভাষ বৃষ্টি হইতে বঞ্চিত তাহারা কি অনাহারে মরিতেছে? না, তা নয় তাহারা আমাদের চেয়ে শত গুণে উন্নত। এ দেশে লোক সাধারণত দুই শ্রেণী ধনী ও দরিদ্র। বড় লোকেরা প্রায় শহরে বাস করে এবং গরীবেরা গ্রামে। মধ্য বিস্ত নাই বলিলে ও চলে। এ দেশীয় লোকের কর্ম শক্তি প্রসংশনীয়। এ দেশে একমাত্র নদী “নাইল” এই নদীই চাষীদের মেরুদণ্ড স্বরূপ। চাষীরা কলের সাহায্যে (By Irrigation) এই নদী হইতে জল উত্তোলন করিয়া চাষ করে। নদীর দুই ধারে প্রায় ২০০/২৫০ মাইল ব্যাপী কলের সাহায্যে জল লইয়া যাওয়া হইয়াছে এর যতদূর পর্যন্ত জল নেওয়া হইয়াছে ততদূর পর্যন্ত লোকের বসতি। ইহার বাহিরে কেবল ধূ ধূ বিশাল মরুভূমি। এদেশে আমাদের দেশের ন্যায় সকল রকমের ফসল উৎপন্ন হয়। শাক সব্জী ও আমাদের দেশের ন্যায় পাওয়া যায়। এ দেশে সাধারণতঃ যাহারা কৃষি বিজ্ঞানে শিক্ষিত (Agriculturist) তাহারা বৈজ্ঞানিক সম্মত চাষ করে।

এ দেশীয় অধিবাসীদের Egyptian বলে। তাহাদের ভাষা আরবি এবং ধর্ম “ইসলাম”। কিন্তু বর্তমান যুগে পৃথিবীর নানা দেশ হইতে লোক আসিয়া এ দেশের স্থায়ী অধিবাসী হইয়াছে। বিদেশীদের মধ্যে বেশী সংখ্যায় দেখা যায় ইহুদী, ফরাসী, গ্রীস, তুর্কী এবং অল্প সংখ্যায় ইটালীয়ান, রাশিয়ান, ডাচ, রুমানীয়ান, বুলগেরীয়ান ইত্যাদি। এ দেশে ফরাসী ভাষা বেশ প্রচলিত। এ দেশবাসী পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত। তাহাদের গায়ের রং ফর্সা এবং শিক্ষিত সমাজে আচার ব্যবহার অনেকটা European ধরনের। তাহারা যদিও মুসলমান কিন্তু পর্দা নাসীন নহে, এ দেশবাসীর সর্বোচ্চ উপাধী পাশা, বে ইত্যাদি। এ দেশের রাজার নাম His Majesty King FARUK এদেশে যতসব সহর আছে প্রায় দেখিয়াছি, তদমধ্যে কাইরো, সুয়েজ, ইশমালীয়া, পোর্টসাইড, হেলোয়ান এবং হেলিও পোলিশ সহরের নাম উল্লেখযোগ্য।

কাইরো (Cario) একটি Cosmopolition City ইহা মিশরের রাজধানী। ইহা নীল নদীর উভয় তীরে অবস্থিত। ইহা আয়তনে বড় এবং আধুনিক সহর এখানে দর্শনীয় অনেক কিছু আছে যেমন-

১। আধুনিক ধরণের উচ্চ বিল্ডিং ১৫/১৬ তলা পর্যন্ত আছে।

২। স্থানে স্থানে মনোরম বিরাট পার্ক (Park)

৩। সুপ্রসিদ্ধ Muslim university.

৪। চিড়িয়াখানা (Zoological garden).

৫। বহুপ্রকারের Museum, যেমন Egyptian Historical, Museum, or wax Museum. Agricultural Museum. Geographical Museum Fish garden ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বহু নৃত্য মন্দির তন্মধ্যে Miss. Badia's Cavaret সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। Miss Badia একজন সুপ্রসিদ্ধা নর্তকী। তাঁহার নৃত্য কলা দর্শন করিবার জন্য ফ্রান্সের অধিবাসীরাও তাহাকে আমন্ত্রন করিয়া লইয়া যাইত। আমিও তাহার নৃত্য দেখিতে সুযোগ পাই। আমি যখন তাহার নৃত্য দেখিয়াছিলাম সেই সময় নাকি তাঁহার বয়স ৫০ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহার নৃত্য ভঙ্গী দেখিলে তাঁহাকে কিছুতেই ২৫/৩০ বৎসরের বেশী বয়স্কা বলিয়া অনুমান করা যায় না। তিনি অনেক সহচরী লইয়া এই নৃত্য মন্দির পরিচালনা করেন। নৃত্য শিল্পেও মিশর অনেক উন্নত। এখানে Half naked dance একটা উল্লেখযোগ্য বিষয় বটে। (অর্দ্ধ উলঙ্গ নৃত্য)।

৬। পৃথিবী বিখ্যাত মহম্মদ আলী মসজিদ এই সহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত।

৭। পৃথিবীর অন্যতম আশ্চর্য্য “মিশরের পিরামিড” এই শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত। ইহা Egyptian Pyramid বলিয়া খ্যাত ছাত্র জীবনে বই এ পড়িয়াছিলাম পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্য্যের মধ্যে মিশরের পিরামিড অন্যতম। ইহা একটি মিশরের প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন। সৌভাগ্যক্রমে আমার ইহাও দর্শন লাভ ঘটিল। এদেশে মোট ১১টি পিরামিড আছে। তন্মধ্যে যেটা সবচেয়ে বড় তাহার বিষয়ে আমি বিশেষভাবে বর্ণনা করিতেছি। এই পিরামিড দেখিবার জন্য কতশত লোক সেখানে প্রত্যেক দিন জড় হইয়া থাকে। ইহা কাইরো সহরের প্রায় ২৫ মাইল দূরে গীজা নামক একটি সাধারণ উচ্চ পাহাড়ের উপর অবস্থিত। ইহা কত শত বর্ষ পূর্বে এবং কে নির্মাণ করিয়াছিল কেহ সঠিক বলিতে পারে না। তবে কথিত আছে অতি প্রাচীন কালে মিশরের রাজা ও রাণী মৃত্যুর পর তাহাদের কবর দেওয়ার জন্য মৃত্যুর পূর্বে তাহারা এই পিরামিড

তৈয়ার করিয়া যান । পিরামিডের ভিতর তাঁহাদের কবর (Coffin) এখনও বর্তমান ।

ইহার বিশেষত্ব এই, ইহা একটি প্রস্থের নির্মিত প্রকান্ত পর্বত চূড়া বিশেষ । ইহার উচ্চতা আটশ ৮০০ ফিট, গোড়ায় ইহা ১০০ ফিট স্কোয়ার, চোপাট হইয়া ক্রমশঃ সরু হইয়া উঠে উঠিয়াছে । পাথরগুলি সব স্কোয়ার ও আকারে সমান । ইহার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা প্রায় পাঁচ ফুট, পাথরগুলি খুব শক্ত ও মজবুত এবং উজ্জ্বল, দেখিলে মনে হয় এখনও নূতন । পিরামিডের ভিতর একটি প্রকান্ত হল । এই হলের ভিতর রাজা ও রাণীর Coffin দুটি পাশাপাশি আছে । ভিতরে মনে হইল দুটি মৃত দেহ । হলের ভিতর গভীর অন্ধকার । আমরা হাতে টর্চ লাইট লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম । পিরামিডটি একটি সামান্য উচু পাহাড়ে অবস্থিত । এই পাহাড়ের গোড়ায় মাটির নীচে একটি প্রকান্ত সুরঙ্গ আছে । ভিতরে গাঢ় অন্ধকার । আলোর সাহায্যে ভিতরে যাইয়া দেখিতে পাইলাম অতি উজ্জ্বল প্রস্থের নির্মিত প্রকান্ত ওয়াল (Wall) স্থানে স্থানে আছে । ইহাতে মনে হইল অতি প্রাচীন কালে এখানে একটি প্রকান্ত বিল্ডিং ছিল, বর্তমানে ইহা মাটিতে চাপ পরিয়া এই রকম অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে । মাটিতে চাপা পরার যথেষ্ট কারণও আছে । এদেশে ধূলা বৃষ্টি (Sand storm) আমাদের দেশবাসীর পক্ষে একটি অকল্পনীয় বিষয় । স্বচক্ষে না দেখিলে ইহার প্রচণ্ডতা অনুমান করা সম্ভব নয় । বাতাসে মরুভূমির বালু উড়িতে থাকে ক্রমান্বয়ে ৫/৭ দিন ধরিয়া । যাই হউক মনে হয় অতীতে যিনি এই পিরামিড তৈয়ার করিয়া ছিলেন ইহা তাঁহারই রাজপ্রাসাদ ।

কাইরোতে অবস্থান কালে এ দেশীয় অনেক অধিবাসীদের সংস্পর্শও আসিয়াছিলাম । এবং তাহাদের পারিবারিক আচার ব্যবহারও লক্ষ্য করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম । কাইরো টাউনে মেজর ফৌজী নামক একজন অতি সভ্রান্ত ব্যক্তি বাস করিতেন । তিনি Egyptian armyতে একজন অফিসার । তাঁহার বাড়ীতে অনেকবার চা নিমন্ত্রণে আপ্যায়িত হইয়াছিলাম । তাঁহার বাড়ীর আচার ব্যবহার সম্পূর্ণ ইউরোপীয়ান style এ । এখানে আমার Russian, French ও Italian family এর সাথে মিশিবার সুযোগ হইয়াছিল । এই সব পরিবারে আমরা ভারতবাসী হিসাবে উচ্চ সমাদর পাইয়াছিলাম । আমার অন্যতম বন্ধু লেফটেন্যান্ট (LIEUTENANT) হাবিবুর রহমান সহ এইসব পরিবারে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলাম । আমার এই বন্ধু হইলেন আসাম নিবাসী । আফ্রিকার ঘোর মরুভূমিতে প্রথম তাঁহার সাথে আলাপ হয় । আমরা

উভয়ে একত্রে বহু দিন ঐ বিদেশে কাটাইয়াছিলাম ।

আমার দেখিতে দেখিতে এই মিশর দেশে দেড় বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল । এই সময় কখনও সহরে কখনও ঘোর মরুভূমিতে এবং কখনো বা গ্রামে অবস্থান করিতে হইয়াছিল । প্রকৃত যুদ্ধ করার পরিবর্তে আমার দেশ ভ্রমণই বেশী সার্থক হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর প্রায় সকল জাতির সঙ্গে দর্শন লাভও ঘটল । এদেশের লোকেরা আমাদের দেখিলে রফিক (বন্ধু) বলিয়া সম্বোধন করিত । এমন কি ছোট ছোট ছেলেরা পর্যন্ত আমাদের দেখিলে রফিক বকশিষ্ বলিয়া আমাদের থেকে পয়সা চাহিত । আর যে কোন লোকের সহিত আলাপ করিলে তাহারা প্রথমে আমাদের জিজ্ঞাসা করিত- রফিক আন্টা মুসলিম? অর্থাৎ বন্ধু তুমি মুসলমান কি? যদি নিজে বলি 'আইউয়া, আনা মুসলিম! অর্থ হইল হাঁ আমি মুসলমান । তাহা হইলে তাহারা অতি সাদরে তাহাদের বাড়ীতে আমন্ত্রণ করিয়া যথোচিত সমাদর করিত ।

এ দেশে পয়সাকে যথাক্রমে মিলিমস (Milims) পিয়েষ্টার (Piasters) ও পাউন্ড (Pound) বলা হয় । দশ মিলিমস এ একপিয়েষ্টার এবং একশত পিয়েষ্টারে এক পাউন্ড হয় । এক পাউন্ড আমাদের ভারতীয় মুদ্রায় তের টাকা সাত আনার সমান হয় । এদেশে আর একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় Sand storm সম্বন্ধে পূর্বেও কিছু লিখিয়াছি । আমাদের দেশে যেমন শিলা বৃষ্টি আর এই দেশে হইল ধূলা বৃষ্টি । অর্থাৎ প্রচন্ড বাতাসে যখন মরুভূমির ধূলা উড়িতে থাকে তখন সমস্ত আকাশ ধূলায় আচ্ছন্ন হইয়া ঘোর অন্ধকার হইয়া উঠে এবং বাড়ী ঘর সব অদৃশ্য হইয়া উঠে এবং অনেক সময় যুদ্ধ পর্যন্ত বন্ধ থাকে । আমি একবার এই Sand storm এ আক্রান্ত হওয়ায় আমার প্রাণ বায়ু বহির্গত হইয়া যাওয়ার অবস্থা হইল । ২/১ ঘন্টা স্থির ভাবে বসিয়া থাকিলে জীবন্ত কবরস্থ হইতে হয় ।

কাইরো নগরী পরিভ্রমণকালে যে Egyptian Historical Museum দেখিয়াছিলাম তৎসম্বন্ধে কিছু বলা উচিত । এই Museum এ মিশরের প্রাচীন কালের সভ্যতার অনেক নিদর্শন সংরক্ষিত হইয়াছে । এখানে মিশরের প্রাচীন যুগ হইতে বর্তমান যুগ পর্যন্ত কি কি পরিবর্তন হইয়াছে এবং হাজার বৎসর পূর্বে মিশর কি রকম ছিল, পঁচিশ বৎসর পূর্বে কি রকম এবং বর্তমানে কি রকম ইত্যাদি মূর্তি আকারে সুন্দরভাবে দেখান হইয়াছে । এই মিউজিয়াম দেখিলে মিশরের প্রাচীন ও বর্তমান

ইতিহাস অনেকটা উপলব্ধি করা যায়। এই মিউজিয়ামের বিশেষ এই যে এখানে মূর্তিগুলি সব মোমে তৈয়ারী করার হইয়াছে সেই জন্য এই মিউজিয়ামের অপর নাম Wax Museum মূর্তিগুলি দেখিলে মনে হয় সব জীবন্ত। এই মিউজিয়ামটিও মিশরের আদি সভ্যতার এইটা নিদর্শন।

যথাকালে আমাদের সৈনিক দল মিশরের কার্যকাল শেষ করিয়া পূর্ব দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। ইতিমধ্যে শত্রুও পরাজিত হইয়া অনেকটা পেছনে হটিয়া গেল। ১৯৪৩ ইংরেজী ১৭ই ফেব্রুয়ারী মিশর রাজ্য পরিত্যাগ করিলাম। কাইরো নগরী হইতে হাইফা শহর পর্যন্ত ট্রেন যোগে আসিলাম। ইহার দূরত্ব ৫০০ মাইল হাইফা প্যালেস্টাইন রাজ্যের একটি প্রসিদ্ধ সামুদ্রিক বন্দর ইহা ভূমোধ্যসাগরের তীরে অবস্থিত ইহার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতীব সুন্দর। ইহার অধিবাসী অধিকাংশই ইহুদী। প্যালেস্টাইনের ভিতর দিয়া আমাদের Train চলিল। প্রাকৃতিক দৃশ্য অপূর্ব সুন্দর, এখানে চির বসন্ত বিরাজমান। এদেশের প্রায় এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত শুধু ফলের বাগান দৃষ্টি গোচর হইল। যেমন কমলা, মাল্টা, নারেঙ্গা, ডালিম, আঙ্গুর ইত্যাদি বহুবিধ ফল এদেশে উৎপন্ন হয়। এই দেশ কেবল ফলের জন্য বিখ্যাত। জল বায়ু ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিক দিয়ে এদেশকে ভারতের কাশ্মীর রাজ্যের সহিত তুলনা করা যায়। এ দেশের প্রসিদ্ধ শহর জেরুজেলাম, হাইফা ও টেলেল বিব। আকর্ষণীয় শহর হাইফা বেশী মনে হইল। জেরুজেলাম খ্রীষ্টান, মুসলমান ও ইহুদীদের পবিত্র স্থান। মুসলমানদের বাইতুল মকদজ উল্লেখযোগ্য। এ দেশে খাঁটি আঙ্গুরের রস হইতে তৈয়ারী এক প্রকার মদ "Red wine" নামে প্রসিদ্ধ। এই মদ্য পানে স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়। খেতেও বেশ আস্বাদ পাওয়া যায়। যাহার মদ্য পানে অনভ্যস্ত তাহার আধ বোতল এই মদ পান করিলে মাতাল হইয়া পরে। ইহা অনেকটা চাক্‌মা মেয়েদের তৈরী জগড়ার ন্যায়। তবে ইহা Chemically pure এবং ভগ্ন স্বাস্থ্যের পক্ষে একটা ভাল Tonic বিশেষ।

প্যালেস্টাইন হইতে মেসোপোটামিয়া দ্বা ইরাক। যথা কালে প্যালেস্টাইন অতিক্রম করিলাম। যাত্রা করিলাম হাইফা শহর হইতে। যাইতে হইবে মেসোপোটামিয়ার রাজধানী বাগদাদ শহরে। এই দুই শহরের মধ্যে দূরত্ব (১২০০) এক হাজার দুইশ মাইল। আমাদের বিরাট কনভয় (Convoy) ৫০০০ পাঁচ হাজার সৈনিক লইয়া এই

বারশ মাইল রাস্তা অতিক্রম করিতে লাগিল। এই ৫০০০ হাজার সৈনিকের জন্য যে কতগুলি মোটর গাড়ীর প্রয়োজন হইয়াছিল তাহা অনুমান করা পাঠকের জন্য রাখিয়া দিলাম। আমাদের সঙ্গে Engineer, Mechanies, ডাক্তার, Electrician, খাদ্য রেশন, পানীয় জল সবই ছিল। আমাদের গাড়ী গুলি প্রত্যহ ভোর ৪ টার সময় রওনা হইত এবং সারা দিন ১৫০/২০০ মাইল অতিক্রম করিয়া বৈকাল ৪/৫ টার সময় আর এক কেম্পে পৌছিলাম। এই রূপে আমাদের বিরাট কনভয় ট্রান্সজোরডনিয়া (Trans jordonia) রাজ্যের ঘোর মরুভূমির মধ্য দিয়া সিরিয়া রাজ্যের প্রান্ত দেশ হইয়া ক্রমান্বয়ে চলিতে লাগিল। প্রত্যেক ১৫০/২০০ মাইলের মধ্যে এক একটি বিশ্রামাগার অবস্থিত। ঐ সব কেম্পে আমাদের রাতে অবস্থান করিতে হইত। সাত দিন পর্যন্ত ঘোর মরুভূমি অতিক্রম করিয়া ইরাক বা মেসোপোটামিয়া রাজ্যে প্রবেশ করিলাম। ঘোর মরু পথ দিয়ে যান বাহন চলাচল করিবার জন্য তৎকালীন বৃটিশ সরকার প্যালেষ্টাইন হইতে বাগদাদ পর্যন্ত সুদীর্ঘ বারশ মাইল সড়ক, কলিকাতা চৌরঙ্গী রাস্তার মত নিৰ্ম্মান করিয়াছিল। এই সড়কের উপর দিয়ে আমরা বিশাল মরুদেশ ট্রান্সজোরডন রাজ্য অতিক্রম করিলাম। পথে কোন লোকালয়ের চিহ্ন দেখিলাম না। তবে অতীব আশ্চর্যের বিষয় এই যে ঐ ঘোর মরুভূমির মধ্যে মাঝে মাঝে উট পৃষ্ঠোপরি নর রাক্ষস রূপী কতকগুলি লোক দেখিলাম। তাহারা পুরাকালে আরব দস্যু নামে প্রসিদ্ধ ছিল বলিয়া জানিলাম। এখনও তাহাদের ভয়ঙ্কর দস্যুবৃত্তি। তাহাদের দেখিলে মনে হয় জীবনে তাহাদের কোন দিন জলের সাথে সাক্ষাৎ হয় নাই। তাহাদের গায়ের চামরার উপর ভীষন ময়লা জমিয়া আছে। তাহারা সব সময় ভেড়ার লোমে তৈয়রী একটি চামড়ার কোট গায়ে দিয়া থাকে পুরুষ মেয়ে সকলের একই রকম পোষাক। এক অসহনীয় দুর্গন্ধে তাহাদের নিকট যাওয়া অসম্ভব। তাহারা সপরিবারে উটের পৃষ্ঠে কিম্বা মরুভূমির গর্তের ভিতর বাস করিয়া জীবন যাপন করে। তাহারা ভেড়া উট পালন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। আমাদের পরিত্যক্ত যত রকমের খাদ্য সামগ্রী তাহারা মাটি হইতে উঠাইয়া লইয়া আনন্দের সহিত ভক্ষণ করিত। ইহারা বর্তমানে বিদুইন্ জাতি বলিয়া পরিচিত। ইহারা ভয়ঙ্কর দুর্ধর্ষ। ইহাদের প্রত্যেকের হাতে বন্দুক কিম্বা যে কোন মারাত্মক অস্ত্র থাকিবেই। এমন কি ছোট ছেলেরাও বিনা অস্ত্রে থাকে না। যদি কাহকেও একা পাইল অমনি তাহাকে আক্রমণ করিয়া হত্যা করিতে চেষ্টা করে। ইহাদের শাসন করিবার জন্যে একজন রাজা আছে। এই রাজার বাড়ী ট্রান্সজোরডনিয়া রাজ্যের মধ্যে।

কনভয়ে আসিবার কালীন এই রাজপ্রাসাদ দেখিয়াছিলাম । ইহারা ইসলাম ধর্মাবলম্বী । ইহারা সারাদিন উটের পিটে চরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায় । তাহারা বছরে দুই একবার শহরে আসিয়া ঐ উট কিসা ভেড়া বিক্রি করিয়া যাহা পাইত ঐ টাকা দিয়া ছয় মাস, এক বছরের খোরাক সংগ্রহ করিয়া পুনঃ ঐ মরুভূমিতে চলিয়া যায় । এই হইল তাহাদের জীবন প্রবাহ ।

কাইরো নগরী হইতে প্রায় সতেরশ (১৭০০) মাইল রাস্তা (ট্রেনে ও ট্রাকে) ঘোর মরুভূমির মধ্য দিয়া অতিক্রম করার পর সপ্তম দিবসে ইরাকের রাজধানী সুপ্রসিদ্ধ বাগদাদ শহরে আসিয়া পৌঁছিলাম । এই ইতিহাস প্রসিদ্ধ শহরের কথাও ছাত্র জীবনে বই এ পড়িয়াছিলাম । এই বার ইহাও প্রত্যক্ষ দেখিলাম । পথে ইউফ্রাইটিস নদী পার হইলাম । এই নদীর অনতি দূরে হাব্বানীয়া নামক একটি বিমান ঘাঁটি ছিল । শুনিয়াছিলাম ঐ জায়গায় প্রথমে এই যুদ্ধের প্রারম্ভে ইরাকের সহিত বৃটিশের যুদ্ধ হয় । যুদ্ধে ইরাক পরাস্ত হয় ।

বাগদাদ শহর অতীব প্রাচীন এবং ইতিহাস প্রসিদ্ধ । পুরাকালে ইহা রাজা হারুণ অল্ রসিদের রাজধানী ছিল । এই শহরটাই গ্রীস নদীর তীরে অবস্থিত । আমরা কাইরো হইতে বাগদাদ পর্য্যন্ত আসিবার সময় তিনজন বাঙ্গালী ডাক্তার এক সাথে ছিলাম । আমি নিজে, ডাক্তার নির্মলেন্দু মুন্সী ও ডাক্তার বীরেন্দ্র কৃষ্ণ পাল এক সাথে ছিলাম । এই তিনজনে এক সঙ্গে, একই কনভয়ে চলিয়া আসি । এই সুদূর রাস্তা অতিক্রম করিবার সময় আমাদের যথেষ্ট কায়িক পরিশ্রম হইয়া থাকিলেও কিন্তু মনের আনন্দ যথেষ্ট ছিল । পথে বোত্রিন (পাঠার) মাংস রান্না করিয়া ডাক্তার মুন্সী মাঝে মাঝে আমাদের আপ্যায়িত করিতেন সে কথা আমার এখনও মনে আছে । সামরিক জীবনের এই সব স্মৃতি মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত মনে জাগ্রত থাকিবে ।

ইরাক বা মেসোপটিমীয়া

এই বার মেসোপটিমীয়া আসিলাম । এই দেশের রাজার নাম কিং ফয়জল (King Faizal) ঐ সময় পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্ব কনিষ্ঠ রাজা, বয়স মাত্র ১০ বৎসর । এই দেশে মাত্র দুইটি নদী টাইগ্রিস্ ও ইউফ্রাইটিস্ । এই দুই নদী এদেশের জীবন । ইতিহাসে পড়িয়াছিলাম মহাবীর আলেকজেন্ডার তাঁহার ভারত অভিযান সমাপ্ত করিয়া

ফিরিবার পথে এই ইউফ্রাইটস্ নদীর তীরে আসিয়া অসুখে আক্রান্ত হন এবং এখানে তাহার জীবন লীলা সাক্ষ হয় ।

আমরা প্রথমে বাগদাদ শহরে কিছু কাল অবস্থান করি । তারপর তুরস্কের সীমান্ত বর্তী মোসুল ও নানা জায়গায় কেম্প করিয়া থাকি । কারকুক নামক এক জায়গায় আমরা অনেক দিন পর্য্যন্ত কেম্প করিয়া থাকি । অতিরিক্ত ঠান্ডায় তুষার পাত জীবনে প্রথম এই কারকুক স্থানেই দেখিলাম । তুষার পাতের সময় প্রকৃতি দেবী আর এক অভিনব সৌন্দর্য ধারণ করে । কোন কোন সময় মাটির উপর প্রায় এক হাটু পর্য্যন্ত বরফ জমিয়া থাকে । এ রকম ঠান্ডা পূর্বের কখনও অনুভব করি নাই । প্রথমে আমার পক্ষে ইহা বড় অসহনীয় হইয়া উঠিল আমি প্রায় great coat গায়ে দিয়া তাম্বুর ভিতর আশ্রয় জ্বালিয়া (Heater) বসিয়া থাকিতাম । যে কোন দিন তুষার পাত দেখে নাই তাহার পক্ষে এ বিষয়ে ধারণা করা বড় কঠিন । দেখিলে মনে হয় যেন শিমুল গাছ হইতে তুলা বাতাসে উড়িয়া আসিতেছে । কোন কোন স্থানে এই বরফ ক্রমাগত জমিয়া পর্বত প্রমাণ আকার ধারণ করে এবং গ্রীষ্মকালে এই বরফ গলিয়া নদীতে রীতি মত বন্যা আরম্ভ হয় । এদেশেরও অনেক জায়গা পরিভ্রমণ করিলাম । তদমধ্যে বাগদাদ, বসরা, আঘার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য আরও অনেক জায়গা এবং গত ১৯১৪ ইংরেজীর প্রথম মহাযুদ্ধের যুদ্ধ ক্ষেত্রও দেখিলাম । তদমধ্যে হার্বার্নীয়া কেফ্রী, টোনুমা, উর কার্কুক, সাইবা ইত্যাদি উল্লেখ যোগ্য । কারবালা রণক্ষেত্র ও বেবিলনের শূন্যোদ্যান দেখিবার সুযোগ হইল না । তবে শুনিতে পাইলাম বর্তমানে এই সব জায়গায় দর্শনীয় কিছুই নাই, কেবল শূন্য স্থান গুলি পরিয়া আছে । এই দুইটি জায়গা বাগদাদ শহর হইতে মাত্র ৫০/৬০ মাইলের মধ্যে । এদেশও অধিকাংশ মরু ভূমি । এদেশে প্রধান চাষ খেজুর । এক একটি খেজুরের বাগান দেখিলে আমাদের দেশের বিশাল রিজার্ভ ফরেস্ট গুলি মনে পড়ে । গরীবেরা প্রায় রুটি ও খেজুর খাইয়া জীবন ধারণ করে । এদেশে মুদ্রাকে যথাক্রমে ফিল্‌স (Fils) ডিনার (Dinar) বলা হয় । এক হাজার ফিল্‌স এ এক ডিনার হয় । এক ডিনার আমাদের ভারতীয় মুদ্রা তের টাকা পাঁচ আনার সমান ।

পারস্য দেশেরও কিয়দংশ দেখিলাম । রাজধানী টেহেরান শহর দেখার সুযোগ হইল না, যদিও এই শহরের অনতি দূরে অবস্থান করিয়া ছিলাম । এ দেশের মুদ্রা কে রিয়াল বলা হয় । দশ Rial এ আমাদের ভারতীয় মুদ্রার এক টাকার সমান হয় । এই

দেশের জলবায়ু অপেক্ষাকৃত ঠান্ডা।

এইরূপে আমার সামরিক জীবনে ওভারসিস (over seas) চাকুরী কালে আমি Egypt, Palastine সিরিয়া, ট্রান্স জোর ডন, ইরাক (মেসোপটিমীয়া) ও ইরান বা পারস্য রাজ্য পরিভ্রমণ করিয়া সুদীর্ঘ তিন বৎসর কাল অতিবাহিত করিয়া দিলাম। এই দীর্ঘ তিন বৎসরের মধ্যে আমার সামরিক জীবন যে কত বার কি ভাবে অতিবাহিত হইয়াছে এবং এই শরীরের উপর দিয়ে কত বার ঝঞ্জা বাতাস বয়ে গেছে, এবং কত রকম দুঃখ কষ্টের সন্মুখীন হইয়া, পাষানে বুক বাধিয়া অম্লান বদনে সব দুঃখ কষ্টকে বরণ করে নিতে হইয়াছিল তার অন্ত নাই। অবসর সময়ে আরবিক চলতি ভাষাও কিছু কিছু শিখিয়াছিলাম। যেমনঃ-

- (১) আন্টা আওজে? তুমি কি চাও?
- (২) ইজ মাক এ? তোমার নাম কি?
- (৩) আইওয়া- হাঁ, Yes,
- (৪) আনা হাকিম- আমি ডাক্তার
- (৫) তালা হেনা - এখানে এসো Come here,
- (৬) রফিক - বন্ধু ময়া- জল
- (৭) সাইদা আফেন্দী -নমস্কার, মহাশয়।
- (৮) ওয়ালেড্ -বালক। বিস্ত বালিকা ইত্যাদি।

এই সমুদ্রের পর পারে থাকা কালীন আমাকে অনেক সময় ঘোর সৈনিক ব্রত অবলম্বন করিয়া বিশাল মরুভূমির উন্মুক্ত বক্ষে বাস করিতে হইয়াছিল, সেই সময় সৈনিক জীবনের ঘোর দুঃখ কষ্টকেও বিপদকে বরণ করিয়া, আকাশে যখন ঘোর মেঘ গর্জনের ন্যায় তুমুল ভাবে বিমান সংগ্রাম চলিতে থাকে এবং শীলা বৃষ্টির ন্যায় বোমা ও বিমান আক্রমণকারী কামানের গুলি বর্ষিত হইতে থাকে তখন ঐ সময় আমাকে কত সুদীর্ঘ শীত রাত্রিতে কাঁপিতে কাঁপিতে আত্মরক্ষার জন্য ভূগর্ভের (Trench) নিভৃত কোনে আশ্রয় লইয়া আধ মরা অবস্থায় কখনও শুয়ে কখনও বসিয়ে, ভগবানের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে রাত্রি যাপন করিতে হইয়াছিল তার অন্ত নাই। সেই বিপদের সময় কত বার সেই পরম মঙ্গল ময় ভগবানকে কাতর স্বরে ডাকিয়া ছিলাম, ভগবান এই বিপদ হইতে আমাকে রক্ষা করো। সেই সঙ্কট মুহূর্তে কত বার স্নেহের পুত্র

পরিবারের কথা মনে উদিত হইয়াছিল এবং কত বার মনে করিয়াছিলাম তারা আমার কে? ইহা তুচ্ছ মায়া জাল মাত্র। কাহার জন্য আমি এত বিপদকে বরণ করি? ঐ ঘোর বিপদের সময় গর্ভের ভিত আশ্রয় নিয়া মনে মনে এইরূপ কত ভাবনাই না ভাবিয়াছিলাম। আর কত রাত্রি না পথ ক্লান্ত শরীর নিয়ে ধূলায় আবৃত অবস্থায় বিনা আহারে ভূমি শয্যা গ্রহণ করিয়া নিদ্রা দেবীর কোলে আশ্রয় নিয়াছিলাম। এদিকে যেমন বিপদ ও দুঃখ কষ্ট অপর দিকে তেমনি আমোদ প্রমোদেরও যথেষ্ট ব্যবস্থা ছিল। অবসর সময়ে খেলাধুলার ব্যবস্থা যেমন ফুটবল, হকি, বেডমিন্টন ইত্যাদি এবং ক্লাব ঘরেও যাবতীয় Indoor games এবং পড়িবার নানা রকমের মেগাজিন্ ইত্যাদির ব্যবস্থা ছিল। এবং রাত্রেও Cinema, Dance (নৃত্য) ও নানা amusement এর ব্যবস্থা হইত। অনেক সময় বন্ধু বান্ধব সমবিভ্যাহারে নুতন নুতন জায়গা পরিভ্রমণ করিয়া আমোদ উৎসবে যোগ দিতাম। এইরূপে বিরহ ও কৰ্ম্ম ক্লিষ্ট হৃদয়ে কিছু শান্তির বাতাস বহিত।

আমি ওভারসিস (overseas) Service করার সময় প্রায় রেজিম্যান্টল ডাক্তার (Regimental Medical Officer) হিসাবে কাজ করিয়াছিলাম। আমার সব সময় ২/৩ জন অর্ডালী (Orderly) কাজে নিযুক্ত থাকিত। তাহারা খুবই অনুগত ও বিশ্বাসী। তাহারা আমার শারীরিক কষ্ট অনেক লাঘব করিয়া দিত সযত্নে পরিচর্যা করিয়া। তাহাদের মধ্যে দুইজনের নাম উল্লেখ করিলাম (১) হিমং সিং জাতে কুমাউনী। (২) রাম ভরসে হিন্দুস্থানী, আমার সব সময়ের পার্শ্বচর। এ স্থলে আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি সৈনিক হিসাবে এই সময় ক্ষেত্রে বিপদ সংকুল জীবন যাপন করিলেও আমার সুখের মাত্রাও নিতান্ত কম ছিল না। এ সময় ভারতীয়দের মধ্যে Commissioned Rank প্রাপ্ত Officer হইলে তাহাদিগকে British Officer হিসাবে গণ্য করা হইত। অতএব আমরা Indian হইলেও British Officersদের মত খাওয়া দাওয়া ও Style বজায় রাখিয়া চলিতে হইত। কাজেই ঐ অভ্যাসের বশবর্তী হইয়া আমাকেও অনেকটা বৃটিশ স্বভাব সম্পন্ন হইতে হইয়াছিল। তবে তাহাদের প্রত্যেকটা অভ্যাস অনুকরণীয় না হইলেও তাহাদের নিকট হইতে আমাদের অনেক বিষয় শিক্ষণীয় আছে, যেমন Word of honour, Discipline, Punctuality ইত্যাদি।

এখানে একটি কথা পূর্বে উল্লেখ করা উচিত ছিল। কথাটি এই আমি মেসোপটিমীয়া পৌছবার অব্যবহিত পরে আমার এদেশে আগমনের সংবাদ খুব কৌশলে বাড়ীতে জানাইয়াছিলাম। মিলিটারীতে সব কিছু গোপনীয়। খোলাখুলি পত্রে কিছুই লেখা যায় না। তাই আমার স্ত্রীর নিকট লিখিয়াছিলাম যেমন “গত প্রথম মহাযুদ্ধে আমাদের বিপিন বাবু যে দেশে আসিয়াছিলেন, আমি বর্তমানে ঠিক সেই দেশে।” কেননা, আমাদের চাক্‌মাদের মধ্যে প্রায় সকলে জানিত যে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় চাক্‌মাদের মধ্যে একমাত্র বীর শ্রী বিপিন চন্দ্র দেওয়ান সাধারণ সৈনিক হিসাবে যুদ্ধে যোগ দিয়া এই মেসোপটিমীয়া রাজ্যে আসিয়াছিলেন। দ্বিতীয় শ্রীবঙ্গ চন্দ্র তালুকদার, তিনিও প্রথম মহাযুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন, আর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আমি নিজে প্রথম সৈনিক, আমার পরে আরও কয়েকজন আমার অনুসরণ করিয়া যুদ্ধে যোগদান করেন।

ভারতে প্রত্যাবর্তন

যথাকালে আমার সমুদ্র পর পারের কার্যকাল শেষ করিয়া ভারতে প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রস্তুত হইলাম। জুবের নামক কেম্প Zoober (Transit Camp) হইতে চলিয়া আসিলাম বসরার নিকটবর্তী আর এক শিবিরে। এই কেম্পে কিছু দিন অবস্থান করিলাম। ইতিমধ্যে আমাদের জাহাজ ভারতে আসিবার জন্য প্রস্তুত। জাহাজ ছাড়িবে “মার্গেল” নামক জাহাজ ঘাট হইতে। এই জাহাজ ঘাট টাইগ্রীস নদীর তীরে, আমরা ভারতে প্রত্যাবর্তন করী প্রায় (২০০০) দুই হাজার। সকলের মনে মহা আনন্দ, যেহেতু অনেক দিন পরে আমরা সমর ক্ষেত্র হইতে স্বদেশের দিকে প্রত্যাবর্তন করিতেছি। ভারতে আসিয়া কিছু দিনের জন্য অবকাশ পাইব এবং সেই সময় বাড়ীতে প্রিয়জনের সহিত দেখা হইবে। অতএব আমাদের আর আনন্দের সীমা রহিল না। সকলে কেবল কখন জাহাজে উঠিব এবং কখন জাহাজ ছাড়িবে এই চিন্তাই উদ্ভিগ্ন। ১৯৪৪ ইংরেজীর ১লা আগষ্ট আমাদের জাহাজে উঠিবার হুকুম হইল। ঐ দিন বৈকাল ৪টা হইতে জাহাজে উঠিতে আরম্ভ করিলাম। রাত্র ১১ টার মধ্যে সকলের জাহাজে উঠা সমাপ্ত হইল। জিনিষ পত্র পূর্বে হইতে জাহাজে বোঝাই করা হইয়াছিল। তারপর দিন ভোর ঠিক ৪টার সময় আমাদের বিশাল রণতরী (২০০০) দুই হাজার আরোহী লাইয়া ভারতের অভিমুখে রওনা হইল। প্রথম দুই দিন কেবল টাইগ্রীস নদী হয়ে আসিলাম। পথে পারস্যের

অন্তর্গত বান্দারাবাস শহর দেখিলাম, এই জায়গা পেট্রোল ও কেরোসিনের জন্য প্রসিদ্ধ। তারপর তৃতীয় দিবসে আমাদের জাহাজ পারস্য উপসাগরে আসিয়া প্রবেশ করিল। আমাদের জাহাজ দিবা রাত্রি অবিশ্রান্ত চলিতে লাগিল। আমাদের জাহাজকে রক্ষা (Escort) করিবার জন্য একটি ক্রুজার রণ সজ্জায় সজ্জিত হইয়া আমাদের পাশে পাশে চলিতে লাগিল। আমি জাহাজে হাসপাতালের কাজে নিযুক্ত হইলাম। এই বার আরোহীদের মধ্যে খুব কম লোকই সামুদ্রিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হইল। আমরা জাহাজে কয়েকজন বন্ধু বান্ধব মিলিয়া নানা গল্প গুজবে আত্মনিয়োগ করিলাম। জাহাজে আমাদের কাজ খুব কমই ছিল। আমাদের সকাল বিকাল খাওয়া দাওয়া ছাড়িয়া বাকী সময়টা নানা খেলাধুলা ও গল্পে কাটাইয়া দিতাম। আর সবসময় চিন্তা করিতাম কখন আমাদের জাহাজ বোম্বে বন্দরে আসিয়া পৌঁছবে। আমাদের জাহাজ শত শত পর্বত প্রমাণ সমুদ্রের জল তরঙ্গের সাথে যুদ্ধ করিতে করিতে পথ ক্লান্ত অবস্থায় ১৯৪৪ইং ১১ই আগষ্ট তারিখে বোম্বে বন্দরে আসিয়া পৌঁছিল। পথে কোন রকম বিপত্তি ঘটে নাই। যখন বোম্বে বন্দর আরোহীদের দৃষ্টির ভিতরে আসিয়া পরিল, তখন তাহাদের আর আনন্দের সীমা রহিল না।

সকলে কোলাহল করিয়া উঠিল, ঐ যে বোম্বে বন্দর আসিয়া পৌঁছিলাম। যখন আমাদের জাহাজ হইতে প্রায় ৫ মাইল বাহিরে ছিল তখন পোর্টের আইন অনুযায়ী আমাদের জাহাজকে কতক্ষনের জন্য থামিতে হইল। ঐ সময় বোম্বে পোর্ট কমিশনারের সাথে নিশান যোগে আলাপ হইল। তারপর পোর্ট কমিশনার আমাদের জাহাজের পরিচয় পাইয়া আমাদের জাহাজ পরিদর্শনে আমাদের নিকট আসিলেন। ইহা প্রত্যেক পোর্টের আইন। পোর্ট কমিশনারের বিনা অনুমতিতে কোন জাহাজ পোর্টে অবতরণ করিতে পারিবে না। যথারীতি পরিদর্শন হইয়া গেল এবং আমাদের পোর্টে অবতরণের অনুমতি দেওয়া হইল। প্রত্যেকেই একটি করিয়া ছাপান অনুমতি পত্র পাইলাম। জাহাজ হইতে অবতরণ করিয়া ডক এরিয়া ছাড়িবার সময় এই অনুমতি পত্র দেখাইতে হইবে। সারিবদ্ধ ভাবে জাহাজ হইতে অবতরণ করিলাম। ডকের উপর এক নিকটস্থ মিলিটারী হোটেলে আমাদের খাওয়ার আয়োজন হইল। আমাদের মধ্যে অনেকেই এক মাসের জন্য ছুটির অনুমতি পত্র পাইয়া গৃহাভিমুখে রওনা দিল। আর যাহারা ছুটির অনুমতি পত্র পাইলাম না তাহাদের বোম্বে নগরীর উপকণ্ঠে কল্যাণী নামক সৈনিক

শিবিরে প্রায় ৭ দিন পর্যন্ত অবস্থান করিতে হইল। তারপর আমি এক মাসের জন্য অবকাশের অনুমতি পত্র পাইয়া বাড়ীর দিকে রওনা দিলাম। বেঙ্গল, নাগপুর রেলওয়ে যোগে সোজা কলিকাতা আসিলাম। সুদীর্ঘ তিন বৎসর ভারতের বাহিরে থাকার পর কলিকাতা আসিয়া মনে মনে খুব আনন্দ অনুভব করিলাম। কলিকাতা রাস্তায় আমার মামা স্বপ্তরের ছেলে শ্রীমান অশোকের সহিত প্রথম দেখা হয় কিন্তু সে আশাতিত ভাবে হঠাৎ আমাকে সৈনিক বেশে দেখিয়া চিনিতে পারিল না। সে আমাকে এক চীনা সৈন্য বলিয়া মনে করিয়াছিল। কাজেই সে আমার অতি নিকটস্থ হওয়া সত্ত্বেও ইতস্ততঃ করিয়া আমার সহিত বাক্যালাপ করিতে পারিলনা। বিশেষতঃ আফ্রিকা দেশে থাকা কালীন আমার স্বাস্থ্যের খুব উন্নতি হয়। অতএব আমার সেই উন্নত স্বাস্থ্য অবস্থায় আমাকে হঠাৎ দেখিলে সকলের পক্ষে চিনাও সম্ভব ছিল না।

তারপর আমি কলিকাতাস্থ আলিপুর মিলিটারী হাসপাতালে এক রাত্র অবস্থান করিয়া বাড়ী অভিমুখে রওনা হই। আমি আমার বাড়ী পৌছিবার কথা পত্রে কাহাকেও জানাই নাই যেন আমি আকস্মিক ভাবে বাড়ী পৌছিয়া সকলকে চমক লাগাইয়া দিতে পারি। ঐ সময় আমার পরিবার রাস্তামাটি স্বপ্তরালয়ে বাস করিতেছিল। আমি ২২শে আগষ্ট ১৯৪৪ ইংরেজী রাত্র প্রায় ১২ টার সময় স্বপ্তরালয়ে পৌছি, তখন সকলে গভীর নিদ্রায় অভিভূত। হঠাৎ আমার সারা পাইয়া আমার স্বপ্তর মহাশয় নিদ্রা ভাঙ্গিয়া চমকাইয়া উঠিলেন এবং প্রশ্ন করিয়া উঠিলেন ‘এত রাত্রে কি করে আসিলে? হঠাৎ তোমার আগমনের আশা আমরা মোটেই করিতে পারি নাই। তারপর একে একে সকলের নিদ্রা ভঙ্গ হইল এবং আমাকে দেখিয়া তাহাদের আর আনন্দের সীমা থাকে না। তারপর আমার সহধর্মিণী বিছানার দিকে আঙ্গুল দেখাইয়া বলিল- এই তোমার সেই মেয়ে যাহাকে তুমি এখনও দেখ নাই।’ এই মেয়ে হইল আমার ২য় কন্যা অঞ্জলী, আমার যুদ্ধে চলিয়া যাওয়ার পর ১৯৪১ ইংরেজী ১৯শে জুলাই, সন্ধ্যা ৬টা ৩৭ মিনিটে তার জন্ম। আমার এই মেয়েকে এই প্রথম দেখিলাম, তাহার বয়স তখন তিন বৎসরেরও অধিক। হঠাৎ আমাকে দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। আমার ছেলেটাও আমাকে চিনিতে পারিল না, সুদীর্ঘ তিন বৎসরের মধ্যে আমার বড় মেয়ে লিলি ও ছেলে শ্যামল আমার কথা এক প্রকার ভুলিয়াই গিয়াছিল। রাত্র প্রভাত হইল। চারি দিকে আমার যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবর্তনের খবর ছড়াইয়া পরিল। এবং যুদ্ধের গল্প শুনিবার জন্য চারি দিক

হইতে দলে দলে আমার নিকট আসিতে লাগিল। অনেকে আমার প্রতি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাইল এবং অনেকে আশীর্বাদ করিল। আমি সামরিক উপাধী Captain পদে ভূষিত হইয়া সুস্থ শরীরে ফিরিতে পারিয়াছি বলিয়া অনেকেই আনন্দ প্রকাশ করিল এবং ধন্যবাদ জানাইল এবং অনেকে আমাকে বীর সৈনিকরূপে অভিনন্দিত করিয়া বলিল “তুমি চাকমা জাতীর মুখোজ্জ্বল করিলে” ইত্যাদি ইত্যাদি। আমিও সকলের প্রতি যথাযোগ্য ভক্তি, শ্রদ্ধা ও আলিঙ্গন জানাইয়া আমার আফ্রিকা রণক্ষেত্রে (Middle East Force) ও PAL Force (Persia and Iraq Force) এর সামরিক অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে নানা কাহিনী শুনাইতে আরম্ভ করিলাম। এভাবে বেশ কয়েকদিন কাটিয়া গেল। অনেকে আমার সামরিক গল্প শুনিয়া অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিল। অনেকে যুদ্ধে যোগদানে আগ্রহ প্রকাশ করিল। ইহাদের মধ্যে একজনের নাম উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না। ইনি আমার একজন আত্মীয়, বর্তমান সম্পর্কে আমার নাতিনী জামাই, নাম শ্রী কৌন্ডিন্য কুমার দেওয়ান। ঐ সময় সে ছিল স্কুলের ছাত্র। সে আমার সামরিক অভিজ্ঞতা শুনিয়া এত অনুপ্রাণিত হইয়াছিল যে তখন আমাকে সে প্রতিজ্ঞা ব্যঞ্জক স্বরে বলিল “আজু! আমিও তোমার পদাঙ্ক অনুসরণ করে যুদ্ধে যাবই। যদি তোমার আশীর্বাদ থাকে।” সত্যই দেখিলাম সে তাহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছে। পরবর্তীকালে সে তাহার পড়া শুনা সমাপ্ত করিয়া সামরিক নৌ-বাহিনীতে যোগ দিয়া নানা দেশ বিদেশ পরিভ্রমণ করে। ঐ সময় সে আমাকে তাহার কর্ণধার ও পার্শ্বত্যা বীর রূপে বর্ণনা করিয়া, তাহার একটি স্বরচিত কবিতা আকারে তাহার অন্তরের স্বশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া আমাকে “বন্দনা” করিয়াছিল। তাহার কবিতাটা নিম্নে লিখিয়া দিলাম - যেমন

“দাদা মহাশয়ের প্রতি”

লেখক :

শ্রী কৌন্ডিন্য কুমার দেওয়ান

পাক নৌ-সেনা

করাচী, ডিগ্ররোড্

তাং : ১৫.১০.১৯৫৬ইং

২৯শে আশ্বিন

“নিত্য নিত্য শোনা যায় দূর বহুদূর-
অবিশ্রান্ত প্রথিবীর দিবা নিশি গান,
ভ্রান্তি হীন, শান্তি হীন, বেদনা বিধুর
চির যুগ যুগান্তর উৎকর্ষিত তান।”

ওহে মম কর্ণধার!

তুমি সত্যি কার!

জাতির কাণ্ডারী তুমি, জ্ঞানের আধার।
উপহাসে হাসি দিয়ে ভুলনা প্রবীন,
জানি আমি, আমি তব অভাগা নাতিন।
কবি নহি আমি কিন্তু জেনো সুনিশ্চয়,
‘এটি মোর ক্ষমা করি’ ঘুচাও সংশয়।
শৈশবে ছিলাম কবে কোন গৃহ কোনে,
কিন্তু আজি কোথা হয় মোরা দুই জনে!
ভুলনা নাতিরে তব, তুমি ত ডাক্তার;
সুদূর প্রবাসী মোরা, আমি যন্ত্রধার।
মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে মানব জনম,
সাধিলে উদ্দেশ্য তব দূর করি ভ্রম।
প্রকৃতির অবদান মানব কল্যাণে,
শোভিতেছে আজি তাই বিশ্বের ভবনে।
অকাম্য একি হয় মৃত্যুর হুঁকার।
রুদ্র মূর্তি মহারণ গ্রাসিল সংসার।
সর্ব গ্রাসী মহারণে মিশরের পথে,
চলে গেছ একা তুমি স্বদেশ জাগাতে।
কৈদেছিল তোমা তরে আত্মীয় স্বজন,
প্রয়ালে বিদেশে তব মুদিয়া নয়ন।

হে চির পার্শ্বত্যাগী বীর।

বিজয়ী ভাস্কর!

তুমি সত্য পরায়ন, গিরি বন্ধু বর।

তরুণ সৈনিক বেশে হ'য়ে অগ্রসর
 রাখিলে অমর কীর্তি যুগ-যুগান্তর
 মৃত্যু বিভীসিকা পথে লক্ষ লক্ষ প্রাণ
 সৈনিক শিবির মাঝে করিয়াছ দান ।
 দুরন্ত সম্মুখ রণে মৃত্যুর দুয়ারে,
 দাঁড়ায়ে একাকী বীর হানিলে শত্রুরে ।
 ঝটিকা সমর মাঝে অগ্নি লেলিহান্ ।
 মানব কল্যাণ তরে বিসর্জিলে প্রাণ ।
 অকাস্মাৎ ভাগ্যাকাশে পবিত্র উদয়,
 বীরের নিশান স্মৃতি, অমর বিজয় ।
 মানবের নাকি কিছু অসাধ্য সাধন,
 চেষ্টায় সফল হয় মানব জীবন ।
 জাগালে সুনাম তাই হানিয়া শত্রুরে,
 রাখিলে জাতীর মান পবর্বত কন্দরে ।
 দূর যাত্রী ছিলে তাই, অজানার দেশে
 নিগূঢ় সন্ধান করি' ফিরিছ স্বদেশে ।
 জাগালে তোমার বানী গগন প্রান্তর,
 ফুটালে প্রতিভা দিগ্ধ যুগ-যুগান্তর ।
 শতাব্দী যুগের ছবি, তুমি বিচক্ষণ,
 দিয়েছিলে পরিচয় পাহাড়ী জীবন ।
 তাহে আজি গাহে তব লক্ষ লক্ষ প্রাণ
 বিজয়ে গৌরব গীতি যুগ অবদান ।
 ধন্য আজি তুমি তাই জগত মাঝার
 উজ্জলিবে চির দিন বীরত্ব তোমার
 অরুণ বরুণ হেন ললাট গগন
 হউক উজ্জল চির, পূণ্য প্রস্রবন ।

হে ক্যাপ্টেন! হে নায়ক!

যুগের প্রবীর!

স্বদেশ প্রেমিক তুমি । বীর হিমাশ্রিত!
 লভিয়াছ নানা জ্ঞান হেরি বহু দেশ,
 আশ্চর্য্য তোমার কীর্ত্তি, অনন্ত অশেষ ।
 উজ্জলিবে চির দিন জ্বলন্ত অক্ষরে,
 গাহিবে বিজয় গান প্রতি ঘরে ঘরে ।
 এস বীর কণ্ঠে সাজি' পারিজাত মালা ।
 চেয়ে আছে তব প্রানে সোনার বাংলা ।
 তব পদ অনুসরি' চলিয়াছি তাই-
 অজানা পথ সন্ধানে মিলন যেথায়!
 ইতে নাহি কোন ভয়, নাহি কোন লাজ,
 সাধেতে বাসনা মম বেরিয়েছি আজ ।
 দক্ষ রৌদ্র, বহি শিখা, কণ্ট নাহি হেরি
 চলিয়াছি অজানায় জীবন বিদারি ।
 দেও মোরে আশীর্ব্বাদ পূরিতে বাসনা,
 শতাব্দী যুগের স্বপ্ন, সকল সাধনা ।
 অভাজনে জ্ঞান দান, হৃদয়ে সাহস;
 রাখিতে পারি গো যেন নানা কীর্ত্তি যশ ।
 বিষাদে সাহস দিও প্রাণে সহিবার,
 শক্তি দিও মুক্তি পথে বানী বহিবার ।
 রহে যেন চির দিন তোমায় আমায়
 অভিন্ন হৃদয় প্রেম মোরা দু'জনায় ।
 হউক চির প্রভাত, ঘুচি' আবর্জ্জনা
 বিমল হৃদয় দুই, এ মোর কামনা ।

ঃ --ঃ

এ সময় আমার স্ত্রী ভয়ানক দস্ত রোগে ভুগতেছিল । তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা
 করিয়া পুনঃ মা ও দাদাদের শ্রীচরণ দর্শনের উদ্দেশ্যে নিজ বাড়ীর দিকে রওনা হইলাম ।
 এক মাস ছুটি অন্তে আলিপুর মিলিটারী হাসপাতালে কাজে যোগ দিলাম । এই

হাসপাতালে এক মাস কাজ করার পর আমি দার্জিলিং শহর হইতে ৪ মাইল ভিতরে লিবং নামক আর একটি মিলিটারী হাসপাতালে বদলী হইয়া যাই। এখানে আমাদের Mess এ (মেসে) সব European Officers কেবল আমি একা Indian Officer ছিলাম। আমাদের Mess Secretary ছিলেন Mrs. Major Sheford. তিনি আমাদের প্রত্যহ খাওয়ার টেবিলে বসিলে গোমাংস খাওয়ার জন্য insist করিতেন। আমি তাহাকে নানা প্রকারে যুক্তি দেখাইয়া এই বিপদ হইতে অব্যাহতি পাই যাই হউক খাওয়ার টেবিলে বসিলে প্রত্যহ Mrs. Major Sheford এর সহিত বেশ একটু রাগের চলিত। এখানে দুই মাস কাজ করার পর, কলিকাতা হইতে ৮ আট মাইল বাহিরে কামার হাটি নামক আর একটি Transit Camp এ বদলী হইয়া যাই। এখানে Indore state এর একজন সামরিক অফিসার Major Sukla, Officer Commanding ছিলেন। এখানে আমরা দুই জনে Privately আমাদের পরিবার আনিয়া একত্রে একই বাড়ীতে থাকিতাম। ১লা জানুয়ারী ১৯৪৫ ইংরেজী হইতে ৪ঠা এপ্রিল ১৯৪৫ ইং পর্যন্ত আমি এই শিবিরে সপরিবারে থাকি। তারপর আমি আমার পরিবার রাক্ষাসাটি স্বস্ত্রালায়ে পাঠাইয়া দিয়া আলিপুর মিলিটারী হাসপাতাল হয়ে, যশোহর শহরের নিকটবর্তী “ঝিগারগাছা” নামক ২৭ নম্বর C.C.S এ (Casualty Clearing Station) বদলী হইলাম। এখানে বন্দী জাপানী সৈন্য ও নেতাজী সুভাষ বোসের আজাদ হিন্দ ফোর্সের বন্দী শিবির ছিল। এখানে হাজার হাজার শত্রু সৈন্য বন্দী অবস্থায় আটক থাকে। আমি তাহাদের জন্য একজন ডাক্তার ছিলাম, এই সময় কিছুদিনের জন্য রানাঘাটে অবস্থিত আর এক শিবিরে কাজ করতে যাই, এ সময় রাক্ষাসাটি হাই স্কুলের ভূতপূর্ব হেড্‌ মাস্টার শ্রীযুত অক্লান্ত নাথ দস্তের সাথে তাঁহার নিজস্ব বাস ভবনে দেখা হয়। তিনি আমাকে নিমন্ত্রণে আপ্যায়িত করেন।

এই সময় যুদ্ধের অবস্থা অনেকটা মন্দীভূত হইয়া উঠে। জাপানের পরাজয় হয় হয় হইয়া উঠিল। এদিকে প্রত্যহ হাজারে হাজারে শত্রু সেনা বার্মা ফ্রন্ট হইতে বন্দী হইয়া বন্দী অবস্থায় ভারতের বিভিন্ন বন্দী শিবিরে প্রেরিত হইতে লাগিল। সকলের তখন একই চিন্তা “কবে এই পৃথিবী ধ্বংসী মহাসমরের অবসান ঘটবে।” এমন সময় হঠাৎ একদিন বেতার (Radio) যোগে শুনিতে পাইলাম ১৯৪৫ ইংরেজী ১৫ আগষ্ট তারিখে জাপান পরাজয় স্বীকার করিয়া সন্ধি প্রার্থনা করিয়াছে। অতএব ঐ তারিখে এই

দীর্ঘ দিনের পৃথিবী ব্যাপী দ্বিতীয় মহাসমরের অবসান হইল। উল্লেখ্য এই মহাসমরে আরম্ভ হইয়াছিল ৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ ইংরেজী উক্ত তারিখে হিটলার পোলেড আক্রমণ করে। যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া আমাদের আর আনন্দের সীমা রহিল না। বৃটিশ সাম্রাজ্যের সর্বত্র উৎসব বানী প্রেরিত হইল। ইংলন্ডের রাজা ষষ্ঠ জর্জ তাঁহার সমস্ত সামরিক বাহিনীর প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন।

Lient Colonel Kal bag ছিলেন আমাদের ঝিগার গাছা Medical Unit এর Commanding Officer, Major Dastidar সহকারী। আরও কয়েকজন ডাক্তার একত্রে কাজ করিতাম। ঐ সময় যুদ্ধ বন্দীদের বিচারের আয়োজন হইতেছিল বিশেষতঃ যাহারা আজাদ হিন্দ ফোর্সে যোগদান করিয়াছিল।

বিচারার্থে অনেককে দিল্লীর লাল কেল্লায় প্রেরণ করা হইল।

যোধপুর দেশীয় রাজ্য ভ্রমণ

ঝিগার গাছা কেম্পে অবস্থান কালে একবার রাজপুতানা প্রদেশের অন্তর্গত যোধপুর দেশীয় রাজ্য পরিভ্রমণের সুযোগ ঘটে। দ্বিতীয় মহাসমর বিজয়ের পর উক্ত রাজ্যের একদল পদাতিক বাহিনী (Battalion) বিজয়ের পতাকা হাতে নিয়ে আপন রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিতেছিল তখন আমি এ পদাতিক বাহিনীর Medical Officer নিযুক্ত হইয়া উক্ত দেশীয় রাজ্যে যাওয়ার সুযোগ পাই। এই দেশীয় রাজ্যের কথা অবশ্য অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন। যোধপুর এই রাজ্যের রাজধানী। এই রাজধানীর উদ্দেশ্যে আমাদের Special train No 2. Jodhpur Infantry Ragiment কে লইয়া ১৯৪৬ ইংরেজীর ২রা মার্চ তারিখে ঝিগারগাছা হইতে প্রায় এক হাজার সৈনিক লইয়া যাত্রা করিল। আমাদের Train ক্রমশঃ চলিতে লাগিল। আমরা ৩রা তারিখে আসান সোল, মিহিজা, মধুপুর, বৈদ্যনাথ শিমূলতলা, ঝা ঝা, কিউল, পাটনা, ডিনাপুর বজ্রার ইত্যাদি স্টেশন অতিক্রম করিয়া গেলাম। ৪র্থ তারিখে আমরা চিত্তকী, নাইনী, এলাহাবাদ, কুনार, কানপুর ইত্যাদি অতিক্রম করিয়া গেলাম, পঞ্চম তারিখে ভোর ৫ টার সময় আগ্রা শহরে আসিলাম। এখানে আমরা এক দিন বিশ্রাম করিলাম। ঐ সময় আগ্রায় তাজমহল ও অন্যান্য দর্শনীয় জায়গা সব দেখিলাম। আগ্রা দুর্গ (Fort)ও দেখিলাম। ঐ রাত্রে আগ্রা শহর পরিত্যাগ করিয়া ভরতপুর আলোয়ার দেশীয় রাজ্যে

আসিলাম । ৬ই মার্চ বৈকাল ৫ পাঁচটার সময় আমাদের Special Train, Jodhpur Station আসিয়া পৌঁছিল । যোধপুর শহর আধুনিক বড় শহরের তুলনায় বিশেষ দর্শনীয় না হইলেও ইহাকে বড় করিয়া রাখিয়াছে সেই অতীত যুগের গৌরবময় রাজপুত নৃপতিগণের ঐতিহাসিক অমর কীর্তি । বর্তমানে এই রাজ্যের রাজা His Highness মহারাজ উমেদ সিং । সেই অতীত যুগের রাজপুত নরপতি গনেরই এক বংশধর । তিনি তাঁহার পদাতিক বাহিনীকে বিজয় অভিনন্দন জানাইবার জন্য আমাদের আগমনের প্রতীক্ষায় যোধপুর স্টেশনে এক বিরাট সামরিক এবং বেসামরিক জনসভার আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলেন । উক্ত জনসভায় রাজ দরবারের যত সব উচ্চ পদস্থ কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন । স্টেটের প্রধানমন্ত্রী সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সামরিক বিভাগের সর্ব প্রধান সেনা নায়ক একজন ইংরেজ জেনারেল রাজার পক্ষ হয়ে প্রথমে আমাদের সামরিক কায়দায় অভিবাদন জানাইবার জন্য উদ্যত হয়ে অপেক্ষা করিতেছিলেন । সমস্ত শহর নব সাজে সুশোভিত । যোধপুর পৌঁছবার অনতি পূর্বে আমাদের কর্ম ক্লাস্ত ট্রেন কিছুক্ষণ পথে বিশ্রাম করিল ঐ সময় আমাদের প্রধান সেনা নায়ক কর্ণেল রাম সিং সমস্ত বাহিনীকে এক জায়গায় একত্র করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে কি প্রকারে রাজ অভিনন্দন গ্রহণ করিতে হইবে এবং কি প্রকারে রাজার প্রতি যথোচিত সম্মান জ্ঞাপন করিতে হইবে ইত্যাদি । ইহাও রাস্তার উপর এক প্রকার ট্রেনিং হইয়া গেল । পঞ্চম দিবসে বৈকাল পাঁচ টার সময় আমাদের ট্রেন যোধপুর স্টেশনে আসিয়া থামিল । তারপর আমাদের কমেন্ডার কর্ণেল রাম সিং ট্রেন হইতে অবতরণ করিয়া যেই প্রধান সেনা নায়ক রাজার পক্ষ হয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতে ছিলেন প্রথমে তিনি তাঁহার সহিত করমর্দন করেন । তারপর আমাদের প্রত্যেক অফিসারকে জেনারেল সাহেবের সহিত পরিচয় করিয়া দেন আমাদের কমেন্ডার সাহেব । তারপর আমাদের প্রত্যেকের সহিত জেনারেল সাহেব ও প্রধানমন্ত্রী করমর্দন করেন । সভায় আমাদের অভিনন্দন জানান হইল আমরাও মহারাজার প্রতি সামরিক কায়দায় অভিনন্দন জানাইলাম । এই সময় সেই বিরাট জনসভা ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া বিজয় উল্লাসে চতুর্দিক হইতে পুনঃ পুনঃ হর্ষ ধ্বনি করিয়া এই নবাগত যুদ্ধ বিজয়ী বাহিনীকে বিজয় অভিনন্দন জানাইতে আরম্ভ করিল । সঙ্গে সঙ্গে রণ বাদ্য বাজিয়া উঠিল । এই বাজনার সাথে তাল মিলাইয়া আমাদের বিরাট বাহিনী ধীরে ধীরে মার্চ করিয়া সৈনিক নিবাসের দিকে চলিতে আরম্ভ করিল । আমরাও যত সব সামরিক অফিসার মহারাজার প্রতি

সালামী শেষ করিয়া সভা ত্যাগ করিলাম ।

আমি একজন নবাগত বিদেশী বলিয়া আমাকে ষ্টেট অতিথি (State guest) হিসাবে গন্য করা হইল । আমি সসম্মানে এই শহরে দুই দিন অবস্থান করি । এই সময়ে আমি যোধপুরের প্রত্যেকটা দর্শনীয় জিনিষ দেখিলাম । শহর পরিভ্রমনের জন্য একটি মোটর গাড়ী আমার জন্য নিযুক্ত হইল এবং মেজর গোলাপ সিং আমার guide হিসাবে সমস্ত শহর ঘুরাইয়া দেখাইলেন । তিনি আমাকে বুঝাইয়া দিলেন প্রাচীন কালে যোধ সিং নামে একজন রাজপুত নরপতি প্রথমে এখানে রাজধানী স্থাপন করেন এবং পরবর্তী কালে তাহারই নামানুসারে এই শহর যোধপুর নামে খ্যাত হয় । আমার অবস্থানের জন্য একটা Bungalow নির্দিষ্ট হয় ।

যোধপুর শহর মোটামুটি দুই ভাগে বিভক্ত প্রাচীন ও আধুনিক । প্রাচীন শহরটি দেখিলে স্পষ্ট বোধ যায় সে কালে যুদ্ধ বিগ্রহ বেশী ছিল বলিয়া শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য রাজধানীকে সুরক্ষিত স্থানে নির্মিত করিতে হইত । সেই কারণে এই শহরটি এমন জায়গায় করা হইয়াছে যাহার তিন দিক উচ্চ পর্বতে পরিবেষ্টিত, এবং অন্য দিকে পর্বত প্রমাণ প্রস্থর নির্মিত উচু প্রাচীর । প্রাচীরের মধ্য দিয়া দুইটি প্রশস্ত রাস্তা এবং রাস্তা দুইটি প্রয়োজনে বন্ধ করারও সুব্যবস্থা আছে । এই দুইটি রাস্তা বন্ধ করিয়া দিলে সেই কালে শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া খুবই সম্ভব ছিল । কিন্তু বর্তমান জগতে বৈজ্ঞানিক বিমান যুদ্ধের নিকট ইহা হার মানিবে সন্দেহ নাই । সেই পর্বত উচ্চ চূড়ায় একটি প্রকাণ্ড কেল্লা (fort) সেই কালে স্বশস্ত্র সমর বাহিনী নগর রক্ষা কল্পে এই প্রকাণ্ড কেল্লার ভিতর অবস্থান করিত । এই কেল্লাটি এখনও ভাল অবস্থায় আছে । বর্তমানে ইহা State Fort হিসাবে ব্যবহৃত হয় ।

রাজ প্রাসাদও দর্শন করিলাম । পরে মেজর গোলাপ সিংকে সঙ্গে করিয়া মিউজিয়াম দেখিতে গেলাম । এই মিউজিয়ামের ভিতর দর্শনীয় অনেক কিছু আছে । এখানে সেই প্রাচীন কালের রাজপুত যোদ্ধাদের নানা প্রকারের সমরাস্ত্র সুরক্ষিত করা হইয়াছে, যেমন সাতফুট লম্বা বন্দুক তরোয়াল, লৌহার জালে নির্মিত কোট, লৌহার টুটি সিঁদু যাহা বক্ষের উপর স্থাপন করিয়া সে কালে সম্মুখ সমর করিত । বল্লম ইত্যাদি নানা রকমের অস্ত্র সম্ভার এখানে সুরক্ষিত । এই সব দেখিলে সত্যিই “রাজপুত” যে এক বীর জাতি ছিল এ বিষয়ে আর সন্দেহ থাকে না ।

এই মিউজিয়ামের ভিতর রাজপুত নৃপতি গণের মূর্তিও পোশাক সিংহাসন ইত্যাদিও আছে। চিড়িয়াখানা, মন্দির রাজ দরবার গৃহ ইত্যাদিও দেখিলাম। সর্ব শেষ উচ্চ প্রাচীরে পরিবেষ্টিত সেই প্রাচীন শহরও দেখিতে গেলাম। শহরের মাঝখানে জলে পরিপূর্ণ একটা প্রকাণ্ড পুকুর হঠাৎ চোখে পড়িল। এই পুকুর দেখিয়া মনে একটু আনন্দ বোধ করিলাম। কেননা এদেশে নাই নদী নাই নালা। আমাদের সুলভ জল এই দেশে অতীব দুর্লভ। শহরের ভিতর আর কতদূর প্রবেশ করিয়া হঠাৎ আর একটি নূতন দৃশ্য চোখে পড়িল। একটি ১০/১১ বৎসর বয়স্ক বালক ও একটি ৭/৮ বৎসর বয়স্কা বালিকা নব পরিচ্ছেদে সজ্জিতা হইয়া একটি উটের পৃষ্ঠে বসিয়া চলিয়া যাইতেছে। উটটিও নানা রং এ রঞ্জিত। একদল মেয়ে পুরুষ নানা বাদ্য বাজনা বাজাইয়া মহা আনন্দে এ বালক বালিকা দুইটির অনুগমন করিতেছে। মেজর গোলাপ সিং কে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পড়িলাম ঐ বালক বালিকা দুইটি নব দম্পতি। তাহাদের বিবাহ উৎসব উজ্জাপিত হইতেছে। জীবনে এই প্রথম বাল্য বিবাহ দেখিলাম। আমার মনে হইল একে বারে ছেলে খেলা। মেজর সাহেব বলিলেন- এই দেশে সচরাচর বাল্য বিবাহ হইয়া থাকে। সেই দিনের মত পরিভ্রমণ করিয়া বৈকালে মিলিটারী কেম্পে ফিরিয়া আসিলাম।

যোধপুর যাওয়ার পথে আরও তিনটি দেশীয় রাজ্য অতিক্রম করিয়া গিয়াছিলাম যেমন ভরতপুর, জয়পুর ও আলোয়ার রাজ্য এই সব জায়গা দেখিয়া আমার মোটামুটি একটা অভিজ্ঞতা হইল যে এই দেশে প্রধান দুর্লভ জিনিষ জল। অবশ্য এই কথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এই দেশ অধিকাংশই মরুভূমি, তবে আফ্রিকা দেশের মরুভূমির তুলনায় এই মরুভূমি কিছুই না। প্রত্যেক গ্রামে ছোট ছোট কুয়া খনন করিয়া পানীয় জলের ব্যবস্থা করে। এই কুয়ার জলে চাষ, শস্য ক্ষেত্রে জল দেওয়া ইত্যাদি করা হয়। এদেশে প্রধান কৃষি জাত দ্রব্য গম, বজরা, ডাল, আলু, ভুট্টা ইত্যাদি। এই দেশের জমির একটি অদ্ভুত শক্তি আছে সামান্য কুয়ার জলে বেশ ভাল ফসল উৎপন্ন হয়। এদেশে নানা রকম শাকশক্তি পাওয়া যায় না। ফলও খুব কদাচিৎ এবং মাছ অনেকটা খাদ্য তালিকা ভুক্ত নয় বলিলেও চলে অঞ্চল বাঙ্গালীদের মাছ না হলে এক দিন চলে না। এদেশ বাসীর প্রধান খাদ্য আটা, বজরা, ডাল, মাংস, দুধ, ঘি ইত্যাদি। এদেশীয় লোক প্রায় হুস্ট পুস্ট বলিষ্ট। ভগ্ন স্বাস্থ্য খুব কমই চোখে পরে গরীবের সংখ্যাও কম মনে হইল।

গাছ, বাঁশ এদেশে খুবই দুর্লভ। এদেশে বাড়ী স্বাভাবিক প্রস্তরে নির্মিত। এদেশে

শ্বেত প্রস্তর পাওয়া যায়। এদেশে উট একটি অতীব প্রয়োজনীয় জন্তু। আমাদের নদী বহুল দেশে যেমন নৌকা না হলে চলে না তদ্রূপ এই মরু দেশে উট না হলে চলে না। উটের দ্বারা বহু কাজ সমাধা হয়। গৃহপালিত জন্তুর মধ্যে উট ভেড়াই প্রধান। বন্য পাখীর মধ্যে ময়ূর প্রধান মনে হইল। ময়ূর প্রায় সর্বত্র দেখিলাম। মরুভূমিতে হরিণের বিরাট ঝাঁক ভ্রমণরত অবস্থায় দেখিলাম। লোকালয় হইতে অনেক দূরে গেলে নাকি নানা প্রকার বন্য জীব জন্তু দেখিতে পাওয়া যায়। পক্ষীর সংখ্যাও কম মনে হইল, কেননা পক্ষীদের বাসা নির্মান করার মত উপযোগী বৃক্ষাদি নাই। ট্রেনে ভ্রমণের সময় যে কয়েকটি বৃক্ষ দেখিলাম তাহাতে আমার মনে হইল তাহারা প্রকৃতির সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম করিয়া কোন প্রকারে আধমরা হইয়া বাঁচিয়া আছে, যেহেতু তাহারা না পায় বৃষ্টি না পায় পৃথিবীর রস খেতে অতএব তাহারা কি প্রকারে জীবন ধারণ করিবে। তদুপরি মাথার উপর প্রচন্ড সূর্য্য কিরণ প্রায় লাগিয়াই আছে। কাজেই তাহারা তাহাদের সব পাতা বিসর্জন দিয়ে কেবল কয়েকটি ডাল লাইয়া বিমর্ষভাবে এক বিন্দু জলের প্রতীক্ষায় চাতক পক্ষীর ন্যায় করুণ দৃষ্টিতে আকাশের পাণে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আছে। তাহাদের এই অবস্থা দেখিয়া আমার মনে একটু করুণার সঞ্চার হইল। মনে মনে চিন্তা করিলাম যদি এখন তোমাদের মাথার উপর সামান্য বারি পাত হইত তাহা হইলে তোমরা সতেজ হয়ে নব নব পল্লব ধারণ করিয়া শক্তি শালী হইয়া সবুজ বর্ণে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিতে। কিন্তু হায়, আমাদের দেশের সুলভ বৃষ্টি হইতে এই দেশ চির বঞ্চিত, তাই মনে হয় আকাশের পক্ষীরাও এদেশ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে। তবে ময়ূর পোষা পাখীর ন্যায় প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়।

এ দেশে সম্ভরহুদ (Sambhar Lake) একটা উল্লেখযোগ্য বিষয়। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় বিশ মাইল। ইহার জল হইতে প্রচুর লবণ উৎপন্ন হয়। ইহা লবণের জন্য প্রসিদ্ধ।

৩য় দিবসে আমি যোধপুর পরিত্যাগ করিলাম। সেই দিন যোধপুর পরিত্যাগ করিবার পূর্বে সকাল ৭টার সময় আমি কর্ণেল রাম সিং এর বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হই।

খাওয়ার টেবিলে বসিয়া দেখি একটি প্রকাণ্ড থালা অন্ততঃ ৪০ প্রকার খাদ্য ব্যঞ্জন ক্ষুদ্র বাটিতে সুসজ্জিত মাঝখানে ঘি মাখা বজরা রুটি। জীবনে এই প্রথম বজরা রুটি খাইলাম। তারপর আমি দিল্লী হয়ে আমার পূর্ব্বের ঝিগার গাছা কেম্পে ফিরিয়া আসিলাম। এই কেম্পে কিছু দিন অবস্থানের পর আমি কাঁচড়া পাড়া কেম্পে বদলী হইয়া

যাই। তখন যুদ্ধ অবসান হইয়া পৃথিবীতে অনেকটা শান্তি ফিরিয়া আসিতেছিল। বৈদেশীক সৈন্য স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতেছিল। আমেরিকান সৈন্যও স্বদেশাভিমুখে রওনা দিল। আমরা তাহাদের পরিত্যক্ত কাঁচড়া পাড়া কেম্প দখল করিয়া নিলাম। বর্তমান কাঁচড়া পাড়া T.B Hospital আমেরিকানদেরই একটি পরিত্যক্ত হাসপাতাল।

ঐ সময় আমাদের ভারতীয় অস্থায়ীভাবে নিযুক্ত সৈনিক ও ডাক্তারদেরও অবসর নেওয়ার প্রশ্ন উঠিল। আমার সঙ্গীদের মধ্যে অনেকে তাহাদের পূর্বের অসামরিক চাকুরীতে প্রত্যাবর্তন করিল। আমিও ২১শে সেপ্টেম্বর ১৯৪৬ ইংরেজী তারিখে বারাকপুর মিলিটারী হাসপাতাল হইতে অবসর গ্রহণ করি। আমাকে সিভিল চাকুরীতে হাজির হওয়ার পূর্বে মিলিটারী গভর্নমেন্ট কর্তৃক ৯২ দিনের ছুটি দেওয়া হয়। ঐ ছুটির সময় আমি বাড়ী চলিয়া যাই এবং সাময়িক ভাবে ভগবান বুদ্ধের শাসনে প্রবজ্যা গ্রহণ করিয়া শ্রামন্য জীবন যাপন করি। তারপর ছুটি অন্তে ১৯৪৬ ইংরেজী ২৩শে ডিসেম্বর তারিখ আমার পূর্বের সিভিল চাকুরীতে যোগ দিই।

সামরিক অভিজ্ঞতা

যুদ্ধে যোগ দেওয়ার পূর্বে আমার যে সামরিক অভিজ্ঞতা কত দূর ছিল তাহা আমি পূর্বেই কিছুটা বর্ণনা করিয়াছি। গত ১৯১৪ ইংরেজীর প্রথম মহাসমরে আমাদের চাকমা জাতি হইতে শ্রীবিপিন চন্দ্র দেওয়ান সাধারণ সৈনিক হিসাবে যুদ্ধে যোগদান করিয়া মেসোপোটমিয়া পর্যন্ত গিয়াছিলেন বলিয়া শুনিয়াছিলাম। তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আমিই প্রথম এই দ্বিতীয় মহাসমরে যোগদান করি। আমি যখন কিছু সামরিক অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া আফ্রিকা হইতে আমার দেশবাসীর নিকট উৎসাহ ব্যঞ্জক পত্র লিখিতে থাকি তখন আমার দেশবাসীদের মধ্যেও কয়েকজন যুবক অনুপ্রাণিত হইয়া আমার অনুসরণ করিয়া যুদ্ধে যোগদান করে।

যুদ্ধে যোগদান করিলে কেবল অর্থোপার্জন হয় না, অর্থোপার্জনের চেয়ে বেশী লাভ হয় দেশ ভ্রমণ করিয়া, যাহা সাধারণ জীবনে সম্ভব হইয়া উঠে না। দেশ ভ্রমণ করিয়া যে রকম প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন করা যায় তাহা পুস্তক পাঠ করিয়া কিম্বা লোক মুখে শ্রবণ করিয়া সম্ভব হইয়া উঠে না। সামরিক জীবন একটা বিরাট শিক্ষার কেন্দ্র যেখানে সামরিক অভিজ্ঞতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে আরও বহুমুখী জ্ঞান অর্জনেরও সুযোগ পাওয়া

যায় এবং পৃথিবীর বহু জাতির সংস্পর্শে আসার সুযোগ হয়।

বর্তমান বৈজ্ঞানিক জগতে যুদ্ধ তিন রকমের স্থল যুদ্ধ, নৌ যুদ্ধ ও বিমান যুদ্ধ। স্থল যুদ্ধ অনেক সময় সন্মুখ সমরে হইয়া থাকে। ঐসময় দুই পক্ষীয় লোকেরা পরস্পরের প্রতি নানা বিধ আধুনিক বিস্ফোরক অস্ত্র প্রয়োগ ও গোলা গুলি বিনিময় করিয়া সন্মুখ সমরে লিপ্ত হয়। তখন উভয় পক্ষে অনেক হতাহত হইয়া থাকে। ঐ আহত সৈনিক দিগকে ঘটনাস্থলে Medical aid দিবার জন্য সাধারণতঃ নিম্নরূপ ব্যবস্থা থাকে যেমন সন্মুখ সারিতে যে সব সৈনিক যুদ্ধে লিপ্ত থাকে তাহাদের চিকিৎসার্থে একটি Medical unit থাকে, তাহাকে বলে Regimental Aid post (R.A.P) এই Medical unit যুদ্ধে রত সৈনিক দলের ঠিক পেছনেই থাকে যাহাতে আহত সৈনিকদের সঙ্গে সঙ্গে ঐ ঘটনা স্থলেই চিকিৎসার (First-aid)এর বন্দোবস্ত করা যায়। এই Medical unit এর প্রায় ১০/১৫ মাইল দূরে আর একটি unit থাকে ইহাকে বলে Advanced Dressings Station (A.D.S) এই খানা হইতে আরও প্রায় ২০/২৫ মাইল দূরে আর একটি Unit থাকে এই unit কে বলে Main Dressings Station (M.D.S) এই Medical station হইতে আরও প্রায় ২৫/৩০ মাইল দূরে আর একটি Medical unit থাকে ইহাকে বলে Casualty Clearing Station (C.C.S) তারপর প্রায় ১০০/২০০ মাইল দূরে থাকে Base Hospital. এই হাসপাতালেই রোগীদের যথাযথ চিকিৎসা করা হয়। আরও আছে Field Ambulance এই Field Ambulance এর কাজ হইল রোগীদের ঐ Front line (R.A.P) হইতে Base Hospital পর্যন্ত বিভিন্ন Medical unit এ বহন করিয়া নেওয়া। বিমান যুদ্ধের বেলায় কোন front line থাকে না, যেখানে বিমান আক্রমণ সেখানেই যুদ্ধ। আক্রমণকারী বিমানকে প্রত্যাহত করা জন্য মাটির উপর সাজান থাকে বিমান ধ্বংসী কামান (anti aircraft gun) যেমন একটি শহরকে বিমান আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে হইলে এ শহরের চতুর্দিকে কয়েকশ গজ অন্তর এক একটি বিমান ধ্বংসী কামান পাতিয়া রাখিতে হয়। বিমান আক্রমণ শুরু হইলে বিমান ধ্বংসী কামান গুলি নীচ হইতে প্রচণ্ড শব্দে আক্রমণকারী বিমানকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুড়িতে থাকে। এই সময় দুই দলের মধ্যে ভীষন সংঘর্ষ বাঁধিয়া যায়। আক্রমণকারী বিমানের সাধারণতঃ Main Target হইল Petrol Tank, Ration



সামরিক শিক্ষাব্রতী ডাঃ প্রমোদ বিকাশ তালুকদার

সংক্ষিপ্ত আত্মজীবনী ও চাকমা সমাজ ব্যবস্থা ৯৯. ৬৮

store, Arms and Ammunitions ইত্যাদি। ঐ সময় বোমা বিস্ফোরণের ফলে বহু লোক হতাহত হইয়া থাকে। বিমান আক্রমণের সময় প্রত্যেককে Trench এর ভিতর আশ্রয় লইতে হয়। Trench এর বাহিরে থাকিলে Splinters (বোমার টুকরা) দ্বারা আহত হওয়ার খুবই সম্ভবনা। ঐ সময় অন্তত গর্ভ না পাওয়া গেলে মাটির উপর উপর হইয়া শুইয়া থাকিলেও অনেকটা নিরাপদ তবে দাঁড়াইয়া থাকা বিপদজনক। বিমান আক্রমণ সাধারণতঃ জ্যোত্স্না রাত্রে হয়। বিমান আক্রমণ শেষ হইয়া গেলে আহতদের চিকিৎসার্থে শুরু হয় ডাক্তারদের কাজ।

জল যুদ্ধ সাধারণতঃ Submarine ও Cruiser সাহায্যে সমুদ্রে হইয়া থাকে। জল যুদ্ধের জন্যও Medical unit এর ব্যবস্থা থাকে, যেমন Hospital ship ঐ জাহাজ হাসপাতালে রোগীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকে। অনেক সময় ঐ Hospital ship এর উপরও শত্রু বোমা বর্ষিত হইয়া থাকে।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি জাহাজে কতকগুলি Discipline মানিয়া চলিতে হয়। প্রত্যেক জাহাজে একজন Captain থাকেন, ঐ Captain জাহাজের সর্বময় কর্তা। তাঁহার হুকুম সব আরোহীকে মানিয়া চলিতে হইবে। প্রত্যেক জাহাজে কয়েকটা Life Boat থাকে। কোন দুর্ঘটনার সময় ঐ Life Boat এর সাহায্যে আত্মরক্ষা করিতে হয়। এছাড়াও প্রত্যেক আরোহীকে জাহাজে থাকা কালীন একটি Life Gacket পরিয়া থাকিত হয়। ঐ gacket এর সাহায্যে বেশ কয়েকদিন সমুদ্রের জলে ভাসিয়া থাকা যায়। ইহা একটি বালিশের আকারে নির্মিত হালকা জিনিষ। জাহাজ ডুবি ঘটিলে শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে Life Boat এ উঠিতে হয়। জাহাজে অনেকে আক্রান্ত হয় সামুদ্রিক ব্যাধিতে (Sea- sickness) স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যও ব্যবস্থা থাকে। জাহাজে Sanitation রক্ষা করা ডাক্তারদেরই প্রাথমিক কর্তব্য।

সামরিক শিক্ষা

প্রত্যেক ব্যক্তি যখন সামরিক বিভাগে যোগদান করে তখন তাহাদের প্রত্যেককে সামরিক শিক্ষা লাভ করিতে হইবে। সামরিক লোক মোটামুটি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত যেমন Combatant ও Non Combatant. যাহারা Combatant তাহারা প্রকৃত অস্ত্র ধারী সৈনিক। আর যাহারা Non-Combatant তাহারা সৈনিক কার্যে সহায়তা

করিবার জন্য সৈনিকের সহগামী স্বরূপ। যেমন, ডাক্তার, ইন্জিনিয়ার, কেরানী, পাচক, ধোপা নাপিত ইত্যাদি। এদের প্রত্যেককে আংশিকভাবে সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। সেই কারনে আমাকেও যুদ্ধে যোগ দেওয়ার প্রথম কয়েক মাস সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। ঐ সময় রীতিমত সৈনিকের ন্যায় Parade করিতে হইত। রাইফেল ও রিভলবার মারা ইত্যাদিও শিখিতে হইবে। প্রত্যহ ভোর পাঁচটার সময় শয্যা ত্যাগ করিয়া প্রাতঃ কৃত্য সমাপনান্তে ঠিক সাড়ে ছয়টার প্যারেডে হাজির হইতে হইবে এবং ক্রমান্বয়ে ১১টা পর্যন্ত প্যারেড চলিবে। তারপর দুপুরে আহারের জন্য কিছু সময় পাওয়া যাইত তারপর আবার বেলা ১ টা হইতে সন্ধ্যা ৭ টা পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ে ক্লাশ করিতে হইত। মিলিটারীতে Discipline, Punctuality ইত্যাদি কঠোর ভাবে মানিয়া চলিতে হয় এবং Rank এর Seniority ও Juniority হিসাবে পরস্পরের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিতে হইবে।

মিলিটারীতে দৈনন্দিন জীবন অনেকটা Routine হিসাবে চলিয়া যায়। সকাল ৬টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্যন্ত প্রায় সব সময় নিজকে হয়ত কোন কাজে, খেলাধুলায় কিম্বা আমোদ উৎসবে নিয়োজিত রাখিতে হয় এমন কি যুদ্ধ ক্ষেত্রেও যতটা সম্ভব আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা থাকে। সৈনিক জীবন সব সময় একটা কর্মের মধ্য দিয়া অতিবাহিত হয় বলিয়া সময় ক্ষেত্রে জীবনটা মৃত্যুর পথগামী হইলেও বাড়ীতে নিজের প্রিয় জনের কথা একবার চিন্তা করিব সেই অবকাশ আর থাকে না। সব সময় একটা কর্মব্যস্ততা না হয় আমোদ প্রমোদে মগ্ন থাকিতে হয়। অবশ্য ইহা বৃটিশ রাজত্বকালে একটা সামরিক ব্যবস্থা। উদ্দেশ্য যাহাতে প্রত্যেকটা সৈনিক আমোদ প্রমোদে আত্মভোলা থাকিয়া প্রিয় জনের জন্য চিন্তা করার মত কোন রকম অবকাশ না পায়।

অসামরিক জীবনে প্রত্যাবর্তন

সামরিক বেশ ভূষা পরিত্যাগ করিয়া পূর্বোক্ত মিলিটারী গভর্নমেন্ট কর্তৃক প্রদত্ত বিরানব্বই (৯২) দিন ছুটি অন্তেঃ পুনঃ অসামরিক জীবনে ফিরিয়া আসিলাম। প্রথমে Campbell হাসপাতালে (বর্তমানে কলিকাতা N.R.S Hospital) এ যোগ দিই। ঐ হাসপাতালে এক মাস কাজ করার পর আমাকে খুলনা জেলার অন্তর্গত সাতক্ষীরা সাব ডিভিসন হাসপাতালে বদলী করা হয়। আমি ঐ হাসপাতালে থাকা কালীন আমার

শ্রদ্ধেয় স্বস্তর ডাক্তার মদন মোহন দেওয়ান এক দূরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া ১৯৪৭ ইং ১১ই মার্চ তারিখ মঙ্গলবার বেলা ১১ টা ৩৫ মিনিটের সময় চট্টগ্রাম সদর হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করেন। তাঁহার শ্রাদ্ধ উপলক্ষে আমি কয়েক দিনের ছুটি লইয়া রাঙ্গামাটি চলিয়া যাই। ছুটি অন্তেঃ পুনঃ উক্ত হাসপাতালে কাজে যোগদান করি। এই সাতক্ষীরা হাসপাতালে অবস্থান কালে ১৯৪৭ ইংরেজী ১৫ইং আগষ্ট বৃটিশ গভর্নমেন্ট ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দিয়া ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। এই স্বাধীনতার ফলে ভারতবর্ষ দ্বিখন্ডিত হয় ও পাকিস্তানের জন্ম হয়। বাঙ্গালা দেশও দুই ভাগে বিভক্ত হয় ঐ সময় চাকুরীর খাতিরে আমিও পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া যাইতে বাধ্য হই।

দেশ বিভাগের পর রাজনৈতিক বিপর্যয়ের শিকার হয়ে বহু চাক্মাও পার্শ্বত্যাগ চট্টগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া ভারতের বিভিন্ন জায়গায় যেমন ত্রিপুরা, মিজোরাম, মেঘালয়, অরুণাচল প্রদেশ ইত্যাদি জায়গায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হয় এবং কতিপয় চাক্মাও আমার ন্যায় চাকুরীতে Option দিয়া পশ্চিম বঙ্গে চলিয়া যায়।

আমি ১৯৪৭ ইংরেজী ১৩ই সেপ্টেম্বর বহরমপুর Special Jail এ First Assistant Surgeon পদে যোগ দিয়া কার্যভার গ্রহণ করি। ঐ সময় ৩০শে জানুয়ারী ১৯৪৮ ইংরেজী মহাত্মা গান্ধী দিল্লীতে আততায়ীর গুলিতে আক্রান্ত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করেন। নাথু রাম গদসে নামক এক মহারাষ্ট্র যুবক রিভলভারের গুলিতে মহাত্মা গান্ধীর জীবনাবসান ঘটান। যথাকালে এখানকার কার্যকাল শেষ করিয়া পশ্চিম দীনাজপুর জেলার সদর মহকুমা বালুরঘাট হাসপাতালে Sadar Sub Divisional Medical Officer হিসাবে কার্যভার গ্রহণ করি। এখানে ১৯৪৮ হইতে ১৯৫৩ ইংরেজী পর্য্যন্ত কাজ করি। এখানে ৪র্থ কন্যা রত্না ও ৩য় পুত্র গৌতমের জন্ম হয়। এই হাসপাতালের কার্যকাল শেষ করিয়া আমি মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত জঙ্গীপুর Sub-Divisional Hospital এ ভারপ্রাপ্ত Medical Officer হিসাবে বদলী হইয়া যাই। এই জঙ্গীপুর হাসপাতালে আমি ১২ই জানুয়ারী ১৯৫৭ ইংরেজী পর্য্যন্ত কাজ করি।

এখানে থাকা কালীন আমার বড় মেয়ে কল্যাণীয়া অনুরাধাকে (ডাক নাম লিলি) শ্রীমান রবীনের সাথে বিবাহ দিই। এখানে আমার সর্ব্ব কনিষ্ঠা কন্যা মনীষার জন্ম হয় এবং আমার বড় ছেলে শাক্য প্রসাদ (ডাক নাম শ্যামল) স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয় হইতে

১৯৫৬ সালে School final পরীক্ষায় কৃতকার্যতা লাভ করে।

আমি জঙ্গীপুরের কার্যকাল শেষ করিয়া ১৯৫৭ ইংরেজীতে হাওরা জেলার অন্তর্গত পুলিশ হাসপাতালে বদলী হইয়া যাই। এখানে আমার বড় মেয়ে School final পরীক্ষা পাশ করে। এখানে স্থানীয় হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ে আমার ২য় মেয়ে অঞ্জলী ও ৩য় মেয়ে মনিকা ভর্তি হয়। ১৯৫৮ সালে অঞ্জলী School final পরীক্ষায় পাশ করিয়া স্থানীয় Girls College I.A. Class এ ভর্তি হয় এবং শ্যামল আগরতলা কলেজে I.Sc. পড়ে ও পরে স্থানীয় দীনবন্ধু কলেজ হইতে I. Sc. পাশ করিয়া Marine Engineering কলেজে ভর্তি হয়। দেবুও স্থানীয় দীনবন্ধু School এ ৭ম শ্রেণীতে ভর্তি হয় এবং এখানে থাকাকালীন আমিও Assistant Surgeon পদে Promotion লাভ করি।

আমি পুলিশ হাসপাতালের কার্যকাল শেষ করিয়া অস্থায়ী ভাবে M.R. Bangur Hospital এ বদলী হই। ১৯৫৯ ইং অক্টোবর এখানে কাজে যোগদান করি। এই হাসপাতালে কাজ করিবার কালীন আমি দুই মাসের ছুটি নিয়ে আমার তৃতীয় পুত্র গৌতমকে সাথে করিয়া একবার পূর্ব পাকিস্তান ঘুরিয়া আসি। এ সময় মাত্র দুই দিন রাঙ্গামাটিতে অবস্থান করি। আমার অগ্রজ বীরেন্দ্র কুমার মহাশয় অকালে ইহধাম পরিত্যাগ করায় আমাদের পাকিস্তানস্থ বাসভবন সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়া যায়। দাদা অপুত্রক ছিলেন বলিয়া তাঁহার মৃত্যুর পর বাড়ী ঘর দেখাশুনা করার মত উপযুক্ত লোক কেহ না থাকায় আমার বৃদ্ধা মাতা ঠাকুরাণী ও বিধবা বৌদি ঐ বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র আশ্রয় লইতে বাধ্য হন। মা বৌদিকে সঙ্গে করিয়া আমার এখানে আসিলেন। আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্যামল স্বয়ং আমাদের কাচলংস্থ বাস ভবনে গিয়া দাদার দাহ ও সাপ্তাহিক ক্রিয়া ইত্যাদি সমাপন করিয়া মা ও বৌদিকে সঙ্গে করিয়া আমার হাওড়া সরকারী বাসভবনে ফিরিয়া আসে। বৌদি কিছু দিন আমাদের সাথে থাকার পর তিনি তাঁহার অগ্রজ শ্রীযুত রঙ্গলাল দেওয়ানের আশ্রয়ে চেকীমুবা ছড়ি গ্রামে পৈত্রিক বাস ভবনে চলিয়া যান। এই সময় আমি বৌদিকে পৌছাইয়া দেওয়ার জন্য রাঙ্গামাটি পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া আসি। আমার মনে হয় ইহাই বোধ হয় ইহ জীবনের মত জন্মভূমির সাথে শেষ দেখা হইল। তখন মাত্র দুই দিন রাঙ্গামাটিতে অবস্থানের সময় কয়েক জন আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধবের সহিত দর্শন লাভ ঘটে। ইহাই জীবনের শেষ দর্শন।

আমি পাকিস্তান হইতে প্রত্যাবর্তন করার পর ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত মীনাখান নামক এক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে বদলী হইয়া যাই। তারপর এ জেলারই অন্তর্গত কলিকাতা নিকটবর্তী মধ্যমগ্রাম নামক আর একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে বদলী হইয়া আসি এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পাঁচ বৎসর কাজ করার পর বারাকপুর Sub Divional Town এ নব প্রতিষ্ঠিত Civil Defence বিভাগে Medical Officer হিসাবে ১লা জানুয়ারী ১৯৬৬ ইংরেজী তারিখে কার্যভার গ্রহণ করি।

ইতিমধ্যে আমার প্রথম ছেলে শ্যামল ২৪শে এপ্রিল ১৯৬৩ ইং কলিকাতা Marine Engineering College হইতে Marine Engineering Examination এ উত্তীর্ণ হইয়া ২৬ শে এপ্রিল ১৯৬৩ ইংরেজী তারিখ Ratnakar Shipping Corporation এ 5th Engineer পদে চাকুরী লাভ করে তারপর সে ঐ চাকুরীতে থাকার সময় ২৮শে জানুয়ারী ১৯৬৪ ইংরেজী ইউরোপ অভিযুক্ত লন্ডন যাত্রা করে পরে বহুবার জাহাজের Engineer হিসাবে নানা দেশ বিদেশে যেমন Europe, America, Russia, Africa, Burma, Finland, French, Poland ইত্যাদি দেশ পরিভ্রমণ করে। তারপর সে তাহার বিদেশ ভ্রমণের আকাঙ্ক্ষা পূরণ হওয়ার পর স্বইচ্ছায় উক্ত Marine Service ছাড়িয়া দিয়া তৎকালীন আসামের অন্তর্গত লুসাই হিলে Chownle নামক অঞ্চলে Administrative Officer পদে আসাম গভর্নমেন্টের অধীনে ১৯৬৮ ইংরেজী ১১ই জানুয়ারী তারিখ, আর এক নূতন চাকুরীতে যোগদান করে। পরবর্তীকালে উক্ত লুসাই হিল আসাম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া মিজোরাম নাম ধারণ করে ফলে শ্যামলের চাকুরীও মিজোরাম সরকারের অধীনে চলিয়া যায়।

ইতিমধ্যে আমার ২য় ছেলে দেব প্রসাদ ১৯৬৬ইং ইংরেজীতে ইতিহাসে অনার্স নিয়ে কলিকাতা ST.Paul's College হইতে B.A. degree লাভ করিয়া M.A. and Law অধ্যয়ন করিতে থাকে। অধ্যয়নে রত থাকা কালীন Indian Air Force এ Committed Officer পদে নিব্বাচনী পরীক্ষায় যোগ্যতা অর্জন করিয়া ১লা জুলাই ১৯৬৭ ইংরেজী Coimbatore Training College এ ভর্তি হয়। যথাসময়ে Training সমাপ্ত করিয়া ২৩শে জুন ১৯৬৮ ইংরেজী (23.6.1968) Committed Officer হিসাবে Pilot Officer Rank এ যোগদান করিয়া

তাহার কর্মজীবন শুরু করে এবং এলাহাবাদের নিকটবর্তী Manauri Air Force Station প্রথম তাহার Posting হয়। আমাদের চাক্মা সমাজে দেবই প্রথম Air Force বিভাগে Commissined Rank প্রাপ্ত হয়।

আমার ২য় মেয়ে অঞ্জলী ১৯৬৩ ইংরেজীতে বারাসাত গভর্ণমেন্ট কলেজ হইতে B.A. Degree লাভ করে এবং পুরুলিয়া BT. College এ ভর্তি হয়। পরে ১৯৬৬ সালে ১১ই অক্টোবর তাহার মাকে সঙ্গে দিয়া ত্রিপুরা রাজ্যে পাঠাইয়া দিই এবং ২০শে ডিসেম্বর ১৯৬৬ ইংরেজীতে ময়নামা নামক গ্রামে Junior High School এ সহকারী শিক্ষিকার পদ লাভ করে। পরে তাহাকে ২২শে জানুয়ারী ১৯৬৭ ইংরেজী (৮ই মাঘ) উক্ত ময়নামা নিবাসী স্বর্গীয় ব্রজমোহন দেওয়ানের ৩য় পুত্র শ্রীমান জ্ঞান মুকুলের সহিত শুভ বিবাহ কার্য সম্পন্ন করিয়া দিই। পরে আমার ৩য় মেয়ে মনিকা (ডাক নাম পুতুল)ও Rabindra Bharati University হইতে M.A Degree লাভ করিয়া ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্গত কৈলাশ শহর Higher Secondary School এ সহকারী শিক্ষিকার পদ লাভ করিয়া ১৯৭২ ইং ২৩মে মার্চ কাজে যোগদান করে। ইতিমধ্যে আমি কলিকাতা Civil Defence এ বদলী হইয়া যাই এবং ১৯৭১ ইংরেজী ১৫ই জানুয়ারী আমার ৫৮ বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়ায় চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করি। কিন্তু এ সময় পশ্চিমবঙ্গে ডাক্তারের অভাব থাকায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার আমাকে পুনঃ চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করার সুযোগ না দিয়া Re-Employment এ চাকুরী করার নির্দেশ দেন এবং ঐ নির্দেশ অনুসারে আমি ১৬ই জানুয়ারী ১৯৭১ ইংরেজীতে ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত সুন্দরবন এলাকায় বেলপুকুর নামক Subsidiary Health Centre এ Medical Officer পদে কাজে যোগদান করি। এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ৭ বৎসর কাজ করার পর ১৯৭৮ ইংরেজী ১৬ই জানুয়ারী তারিখ আমার Re-Employment কার্যকাল শেষ করিয়া সম্পূর্ণ রূপে চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করি। এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রে অবস্থান কালে আমার পরমারাধ্যা মাতৃদেবী ১৯৭২ ইংরেজী ৯ই মে মঙ্গলবার বেলা ৩টা ৩০ মিনিট (9.5.1972 at 3-30 pm) সময়ে আমার সরকারী বাসভবনে তাঁহার শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। আমার এই দুঃসময়ে অকাতরে আমাকে সাহায্য করিয়াছিলেন বেল পুকুরের কয়েকজন অধিবাসী। তাঁহাদের মধ্যে শ্রীবৃন্দাবন প্রামানিক ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ছেলে নন্দের নাম উল্লেখযোগ্য। এই ঘোর

বিপদের সময় আমার ছেলে মেয়েরা কেহই কাছে ছিল না কেবল আমার সর্ব্ব কনিষ্ঠা কন্যা মনীষা ছাড়া। স্বজাতি কিম্বা স্বসমাজ হইতে আমি চাকুরী খাতিরে বহু বৎসর যাবত বিচ্ছিন্ন হইয়া আছি, অতএব এই দুঃসময়ে আত্মীয় স্বজনের কিম্বা স্বজাতির কিছু সহায়তা লাভ করিব তাহা কল্পনাই করিতে পারিনা। বিপদের সময় যাহার নিকট হইতে অকৃত্রিম সহায়তা লাভ করা যায় সেই প্রকৃত বন্ধু, আমার চাকুরীর শেষ সাতটি বৎসর ক্রমান্বয়ে এই বেলপুকুরে অতিবাহিত হওয়ার কারণে এই জায়গার স্মৃতি আমার পক্ষে সহজে ভুলিবার নয়। বিশেষতঃ আমার মাতৃদেবী এই জায়গায় তাঁহার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে পরলোক গমন করেন এবং আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান শাক্য প্রসাদের প্রথম কন্যা নবীনার এই বেলপুকুরস্থ সরকারী বাসভবনে জন্ম হয় এবং আমার ৪র্থ কন্যা রত্না, ৩য় পুত্র গৌতম ও ৫ম কন্যা মনীষা এখানে থাকা কালীন তাদের B.A degree লাভ করে।

আমার কর্মজীবনের প্রায় সুদীর্ঘ ৩৬ বৎসর বিদেশে বিসমাজে ও আত্মীয় স্বজন হইতে দূরে থাকিয়া সরকারী কাজে লিপ্ত থাকি। এই ৩৬ বৎসরের মধ্যে প্রায় ৪ বৎসর ভারতের বাহিরেও কাটিয়া ছিল। বাকী ৩২ বৎসর ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ ভাবে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় চাকুরীর খাতিরে অবস্থান করিতে হয়। এই হেতু আমার ছেলে মেয়েদের মধ্যে মনিকা হইতে মনীষা পর্য্যন্ত জন্ম গ্রহণ করে পশ্চিমবঙ্গে আর প্রথম চার জনের জন্ম হয় পার্শ্বত্যা চট্টগ্রামে। আশৈশব তাহারা বিদেশে ভিন্ন সমাজে ও ভিন্ন পরিবেশে বর্দ্ধিত ও শিক্ষা শিক্ষা লাভ করার ফলে তাহাদের স্বজাতি স্বসমাজ ও আত্মীয় স্বজনকে ভুলিয়া যাওয়ার প্রায় অবস্থা হইয়া উঠিল। অতএব চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করার পর শেষ জীবনটা স্বসমাজে ও আত্মীয় স্বজনের মধ্যে থাকিয়া অতিবাহিত করার ইচ্ছা করিলাম। অবশ্য ছেলে মেয়ে ও জামাতাদের প্রত্যেকের মত লইয়া চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিলাম ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলা শহরে স্থায়ী বসবাসের ব্যবস্থা করিব, অবশ্য পশ্চিমবঙ্গে স্থায়ী অধিবাসী হইয়া বসবাস করারও কিছুটা ইচ্ছা ছিল এবং চেষ্টাও করিয়া ছিলাম কিন্তু কয়েকটা কারণে শেষ পর্য্যন্ত তাহা আর হইয়া উঠিল না, তাহাও হয়ত ভগবান তথাগতের ইচ্ছানুক্রমে অতএব ১৯৭৮ ইংরেজী ৯ই এপ্রিল তারিখ ভগবান তথাগতের নাম স্মরণ করিয়া দমদম বিমান হইতে আগরতলা উদ্দেশ্যে সপরিবারে বিমান যোগে রওনা দিলাম। আমাদের বিমান প্রায় দেড় ঘণ্টা

আকাশ পথে চলার পর নিরাপদে সিংগারবিল বিমান বন্দরে অবতরণ করিল। বিমান হইতে অবতরণ করিয়া দেখি আমার ২য় জামাতা মুকুল স্বপরিবারে আমাদের অপেক্ষায় বিমান বন্দরে উপস্থিত। বহুদিন পর পরস্পরের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ হওয়ার আমাদের আর আনন্দের সীমা রহিল না।

আশা করিয়াছিলাম বুদ্ধ মন্দিরের নিকটবর্তী বড় রাস্তার ধারে একটি ছোট দৌতলা বিল্ডিং (Building) করি, কিন্তু অনেক চেষ্টা করা সত্ত্বেও কোথাও নিজের পছন্দমত জমি না পাওয়াতে শেষ পর্যন্ত অনেকটা নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে শ্রীমান মুকুলের পার্শ্ববর্তী ছোট এক খন্ড জমি ক্রয় করিতে বাধ্য হইলাম। উক্ত জমির উপর ৭ই মে ১৯৭৯ ইংরেজী বেলা ৮টা ৩০ মিনিটে (7th May 1979 at 8-30 am) Building নির্মাণের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হইল। আমার ২য় পুত্র শ্রীমান দেব প্রসাদের শুভ বিবাহ কার্য নাগপুর নিবাসী প্রবাসী বাঙ্গালী শ্রীমনিন্দ্র নাথ সিংহের একমাত্র কন্যা কল্যাণীয়া রুবীর (Double M.A; B.T) সহিত এই ভিটা বাড়ীতে ২৩ শে ডিসেম্বর ১৯৭৮ ইংরেজীতে সুসম্পন্ন করিয়া দিই।

১৯৭৯ ইংরেজী ফেব্রুয়ারী মাসে আমার ৪র্থ কন্যা রত্না ত্রিপুরা সরকারের অধীনে একটি উচ্চ বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষিকার পদ লাভ করে এবং ৩য় পুত্র গৌতমও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে Inspector of Commercial Tax পদ লাভ করিয়া চাকুরীতে যোগদান করে।

আমার ৫ম কন্যা মনীষা Bhopal University হইতে Sociology ১৯৮০ ইংরেজীতে Master Degree লাভ করে এবং পরে M. Phil Degree লাভের উদ্দেশ্যে উক্ত Universityতে পুনঃ অধ্যয়নেরত হয়। কিন্তু ভগবান তথাগতের আশীর্বাদে ১৯৮২ ইংরেজী ১৪ই জুন তারিখ Air India Department এ একটি চাকুরী লাভ করিয়া দিল্লী মহানগরী পালাম Air Port এ কাজে যোগদান করিয়া তাহার প্রথম কর্মজীবন আরম্ভ করে।

তাহার চাকুরী লাভের সঙ্গে সঙ্গে আমি স্বস্থির একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া ভগবান বুদ্ধের প্রতি আমার আন্তরিক গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলাম এবং মনে মনে ভগবান বুদ্ধের প্রতি অশেষ ধন্যবাদ জানাইয়া বলিলাম “ভগবান তুমি আমার দীর্ঘ দিনের মন

বাসনা পূরণ করিয়া দিয়াছ।”

আমি পূর্বেই বলিয়াছি রাজনৈতিক বিপ্লবের অঘোর স্রোতে ভাসমান হইয়া দেশ বিভাগের পর আমাদের পার্শ্বত্যাগ চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত কাচলং নদীর উপত্যাকায় হাতীলাদ ছড়া নামক গ্রামে নিজস্ব ঘরবাড়ী স্থাবর অস্থাবর যাবতীয় সম্পদ পরিত্যাগ করিয়া এবং আত্মীয়স্বজন ও স্বসমাজ বিবর্জিত হইয়া একমাত্র চাকুরীর উপর নির্ভরশীল হইয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে চাকুরী করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম।

আমার অগ্রজ শ্রীবীরেন্দ্র কুমার তালুকদার আমাকে লেখা পড়া শিখাইয়া মানুষ করিয়াছিলেন এবং আমার কর্ম জীবনে তিনিই ছিলেন আমার একমাত্র সহায় সঞ্চল কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তিনি আমাকে সংসার সমুদ্রে ভাসাইয়া দিয়া ভগবানের ইচ্ছানুক্রমে অকালে সাংসারিক সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়া ইহধাম পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে আমাদের বাড়ীঘর ও ধন সম্পদ ইত্যাদি রক্ষণাবেক্ষণ ও দেখা শুনা করার মত উপযুক্ত লোক আর কেহই ছিলনা এবং আমার পক্ষেও চাকুরী ছেড়ে সেখানে চলে যাওয়া কিছুতেই সম্ভব ছিলনা। অতএব আমাদের যাবতীয় স্থাবর সম্পত্তি ধ্বংসের মুখে পতিত হইয়া সম্পূর্ণ বিলুপ্তি হইয়া যায় এবং তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের কবলগত হইয়া পড়ে। অতএব আমার জন্মভূমিতে নিজস্ব সম্পদ কিম্বা সহায় বলিতে আর কিছুই রহিল না। অতএব সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থায় একমাত্র চাকুরীর উপর নির্ভর করিয়া পশ্চিমবঙ্গে জীবন সংগ্রামে লিপ্ত হইতে বাধ্য হইলাম। তখন আমার মনে এই ভাবনার উদয় হইল, আমার জীবনাবসান ঘটিলে আমার ছেলে মেয়েদের দাঁড়বার মত আর কোন স্থান থাকিবেনা এবং পৈত্রিক সম্পদের অধিকারী হওয়ারও কিছুই নাই। অতএব বিদ্যাই হইবে তাহাদের অমূল্য সম্পদ। আমার মৃত্যুর পর তাহারা যাহাতে প্রত্যেকে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল না হইয়া স্বাধীনভাবে আত্মভরণ পোষনের যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। সেই ভাবে তাহাদের প্রত্যেককে নিজের ক্ষমতানুযায়ী স্কুল হইতে কলেজ এবং University পর্যন্ত লেখা পড়া শিক্ষার সম সুযোগ দিতে সিদ্ধান্ত নিলাম এবং মনে করিয়াছিলাম যে যতটুকু বিদ্যা অর্জন করিতে পারিবে সেটাই হইবে তাহার পৈত্রিক সম্পদ। তারপর আমি আমার স্বর্বস্ব পণ করিয়া ছেলে মেয়েদের শিক্ষা প্রদানে বদ্ধ পরিকর হইলাম এবং ভগবান বুদ্ধের নিকট তখন এই প্রার্থনা করিয়াছিলাম “আমার ছেলে মেয়েরা প্রত্যেকে অন্ততঃ Graduate হউক” B.A.

Degree লাভ করিতে পারিলে অন্ততঃ নিজের পায়ে নিজে দাড়াবার মত কিছুটা যোগ্যতা অর্জন করিবে। তাই যেই মুহূর্তে আমার পুত্র কন্যাদের মধ্যে সর্ব কনিষ্ঠা মনীষা M.A Degree লাভ করার পর Air India Department এ Delhi Palam Air Port একটা চাকুরী লাভ করে, তখনই আমি একটি স্বস্থির দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া ভগবান বুদ্ধের নিকট আমার অন্তরের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলাম এবং মনে মনে বলিলাম “হে ভগবান বুদ্ধ, তুমি আমার প্রার্থনা ও দীর্ঘ দিনের মন বাসনা পূরণ করিয়া দিয়াছ” এবার আমি সাংসারিক দায়িত্ব হইতে অনেকটা মুক্ত। এবার প্রত্যেকে আশাকরি স্বাবলম্বী হইয়া স্বঅর্জিত অর্থে নিজ জীবন ধারণে সক্ষম হইবে।

জন্ম মৃত্যু মানবের ইচ্ছাধীন নয়। সেই রূপ ইহ জগতে আমার বিশ্বাস, বিবাহ বন্ধনও অনেকটা ভগবানের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, যাহা সম্পূর্ণ মানবের কর্ত্তের অধীন নয় বলিয়া আমি মনে করি। অতএব আমি ভগবান তথাগতের করুণার উপর আমার সেই বাকী দায়িত্ব ছাড়িয়া দিয়া ইহ জীবনের মত সাংসারিক যতদূর সম্ভব, কামনা বাসনা মুক্ত হইয়া পারলৌকিক চিন্তায় বাকী জীবনটা অতিবাহিত করিতে ইচ্ছা করি।

সাংসারিক জীবনে আমার ছেলে মেয়েদের সকলের মঙ্গল কামনা করিয়া ও “বহু জন সুখায়” “বহু জন হিতায়” ভগবান বুদ্ধের নিকট আমার শেষ প্রার্থনা জানাই।

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।

ধম্মং শরণং গচ্ছামি।

সংঘং শরণং গচ্ছামি।

-ঃ সমাপ্তি ঃ-

কয়েকটি বিক্ষিপ্ত স্মরণীয় ঘটনাবলী

(১) তখন আমার বয়স পাঁচ বৎসর পূর্ণ না হলেও আমার স্মৃতিতে এখনও একটা ঘটনা পরিষ্কার বিরাজমান -সেইদিন মা ও জেঠিমার সাথে জুমে গিয়েছিলাম। হঠাৎ গুজব রটিল সেই রাতে নাকি কুকীরা আসিয়া আমাদের গ্রামে আক্রমণ করিবে। তখন ছিল চাক্মাদের মধ্যে কুকীর আক্রমণ একটা ভয়াপ্রদ ব্যাপার। কুকীরা আচম্কা আক্রমণ করিয়া চাক্মাদের হত্যা করিয়া জিনিষপত্র লুণ্ঠন করিয়া নিত এবং বিশেষভাবে যুবতী মেয়েদের হরণ করিয়া নিত। অর্থাৎ তৎকালীন আমাদের দেশে ছিল কুকীর ভয় যেমন নাকি এক সময়ে বঙ্গদেশে ছিল বর্গীয় উৎপাত। সে যাই হউক, ঐ গুজব শুনা মাত্রই আমার জেঠিমা একটি কালুয়াং এর (বাঁশের ঝুরি) ভিতর আমাকে বসাইয়া পিঠে করিয়া মা'সহ অদূরবর্তী জঙ্গলে একটা উচু প্রকান্ত গাছের ফারীতে (চাক্মা কথায় চিবিং গাছ বলে) নির্বাক অবস্থায় সারা রাত্র বসিয়া রহিলাম, আত্মগোপন করিয়া। পরদিন সকালে জানিতে পারিলাম কুকীরা ঐ রাতে আক্রমণ করিতে আসে নাই। তারপর আমরা আত্মপ্রকাশ করিয়া বাড়ী ফিরিলাম।

(২) ঐ যুগে কুকীরা ছিল অত্যন্ত হিংস্র (Ferocious) ও নরঘাতক। প্রবাদ আছে তদকালে বহু চাক্মা কুকীর হাতে প্রাণ বিসর্জ্ঞন দেয়। কুকী কর্তৃক বদা চোখী হরণ চাক্মা সমাজে একটা বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। তখন আমাদের ছিল কাক পর্যা নামক ছোট একটি গ্রামে বাঁশের তৈরী মাচাং বাড়ী। সেইদিন দাদারা কেহ বাড়ী ছিল না, কেবল মা, জেঠিমা, আমি ও বৌদি তাঁহার কোলে তাঁহার নবজাত শিশুপুত্র সুমতীরঞ্জন সহ। আমার বয়স হয়ত পাঁচ বৎসরের উপর হইয়াছে। সকালে হঠাৎ এক মদ পাগলা দাদাদের অনুপস্থিতির সুযোগ পাইয়া আমাদের অশ্লীল ভাষায় গালাগালি করিতে লাগিল। মা সেই অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া সঙ্গে সঙ্গে এক খন্ড বাঁশ নিয়ে ঐ লোকটার মাথায় ও পিঠে বেশ জোরে কয়েক ঘা মারে। ফলে লোকটা অচেতন্য হইয়া পরে। এই ফাঁকে তাড়াতাড়ি অন্য বাড়ীতে আশ্রয় নিলাম। পরে গ্রাম্য বিচারে ঐ লোকটা দোষী সাব্যস্ত হইয়া শাস্তি ভোগ করে এবং মার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। তখনকার দিনে গ্রাম্য সালিশী ছিল একটা বেশ ক্ষমতা সম্পন্ন ক্ষুদ্র আদালত বিশেষ।

(৩) তখন আমাদের বাড়ী ছিল কাচলং নদীর পারে হাতীলাড্ ছড়া গ্রামে। ঐ এলাকায় লোকের বসতি খুব কম ছিল। প্রায় জঙ্গল বলিলে চলে, এই কারণে মাঝে

মাঝে রাত্রে বন্য হাতী আসিয়া নানারকম উপদ্রব করিত, যেমন কোন সময় ধানের ক্ষেত নষ্ট করিত, বাড়ী ঘর ভাঙ্গিয়া দিত। বাগানের কলা গাছ ইত্যাদি খাইয়া ফেলিত। আমরা অনেক সময় বাড়ী ছাড়িয়া অন্যত্র পালাইয়া যাইতাম। বন্য হাতী হইতে ধানের ফসল রক্ষা করার জন্য জমির ধারে হাতি আসার সম্ভাব্য রাস্তার উপর একটি বড় উচু গাছের উপর আমার মেজদা একটি টং ঘর (২/১ জন লোক ঘুমাতে পারে এই রকম একটা ছোট বাঁশের তৈয়ারী মাচাং গাছের উপর তৈয়ার করা হয়) করিয়া দিলেন। ইহা হাতীর নাগালের বাহিরে। গাছটিও বড় বলিয়া হাতীতে ভাঙ্গার কোন সম্ভাবনা নাই। একরাত্র আমি আমার এক সঙ্গী হাতি তাড়াইবার জন্য সুসজ্জিত অবস্থায় ঐ টং ঘরে শুইয়াছিলাম। আমাদের অস্ত্র ছিল বেনা (ইহা আগুন জ্বলাইয়া রাখার ধানের খর দিয়ে তৈয়ারী এক রকম লাকড়ী বিশেষ। চাক্‌মারা জমিতে কাজ করার সময় ইহা প্রায় ব্যবহার করে), বাদল (বাঁশের ধনুক) ও ঢোল ইত্যাদি। ঐ দিন আমরা সন্ধ্যার পূর্বে খাওয়া দাওয়া করিয়া টং ঘরে অবস্থান করিতেছিলাম। অল্পক্ষণের মধ্যে বেশ কয়েকটা দন্তধারী হাতী দলবদ্ধ অবস্থায় আমাদের গাছের নীচ দিয়ে জমিতে ধান খাওয়ার উদ্দেশ্যে নামিতেছিল। তন্মধ্যে একটা হাতি আমাদের গাছ ঘেষে টং ঘরের নীচ দিয়া যাইতেছিল, তখন সঙ্গে সঙ্গে আমরা দুই জনেই কয়েকটা জ্বলন্ত বেনা হাতীর পিঠে ফেলিয়া দিলাম। তারপর ঐ হাতী বিরাট চিৎকার করিয়া ছুর মুর করিয়া পালাইতে আরম্ভ করিল, সঙ্গে সঙ্গে আমরা ঢোল বাজাইতে ও বাদল দিয়া গুলি ছুড়িতে আরম্ভ করিলাম। জঙ্গলী হাতী ঢোলের শব্দ শুনিয়া ভয়ে বিকট গর্জন করিয়া দলবদ্ধ অবস্থায় পুনঃ জঙ্গলে ফিরিয়া গেল। আমরা হাতীর এই অবস্থা দেখিয়া আনন্দে হাসিতে লাগিলাম। ঐ সময় আমাদের এলাকায় অত্যধিক হাতীর উপদ্রব ছিল এবং তৎকালে কাচলং নদীর Reserve forest বন্য হাতীর জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। ঐজঙ্গলে প্রায় প্রতি বৎসর হাতী ব্যবসায়ী আসিয়া হাতী ধরার ফাঁদ (খেদা) পাতিয়া হাতী ধরিত। এই খেদায় হাতী ধরা এক আনন্দদায়ক দৃশ্য। যাহারা হাতী ধরা কাজে ওস্তাদ তাহারা জঙ্গলের ভিতর একটা নির্দিষ্ট জায়গায় ফাঁদ (বেটনী) তৈয়ার করিয়া রাখে। ঐ ঘেরার ভিতর জঙ্গলী হাতী ঢুকাইয়া পোষা হাতীর সাহায্যে একটা একটা করিয়া ঐ জঙ্গলী হাতীদের বাঁধিয়া ফেলে।

(৪) এক সময় গভীর রাত্রে উপরোক্ত গ্রামে আমাদের নব নির্মিত বাঁশের মাচাং বাড়ীতে ফান্নুয়া গালা নামক জনৈক বদমাইশ চাক্‌মা আক্রোশ বশতঃ আগুন লাগাইয়া দেয়। তখন বাড়ীতে সকলে আগুন নির্বাপিত ও জিনিষ পত্র রক্ষা করার কাজে অত্যন্ত

ব্যস্ততার সহিত এদিক সেদিক পাগলের মত দৌড়াদৌড়ি করিতেছিল। মা'র এই ব্যস্ততার মধ্যে আমাকে ঘুম হইতে তুলিয়া নেওয়ার কোন খেয়ালও ছিল না। তখন আমার বয়স ৭/৮ বৎসর হইতে পারে। আমি ঘুমে বিভোর। হঠাৎ যেন স্বপ্নের মধ্যে দেখিতে পাইতেছি আমার বুকের উপর আগুন জ্বলিতেছে। তখন ভয়ে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল এবং চোখ খুলিয়া দেখি সত্যিই আমার বুকের উপর ছনের ছাদের আগুন জ্বলিতেছে। তখন আমি মা মা বলিয়া চিৎকার করিতে করিতে ঘর হইতে বাহির হওয়ার জন্য পথ খুজিতেছিলাম। হঠাৎ চোখে পড়িল একটু ফাঁক। ঐ পথে দৌড়ে ঘর হইতে বাহির হইয়া মাচাং বাড়ীর চানা (বারান্দা বিশেষ) হইতে এক লাফ দিয়া মাটিতে পড়িলাম। তখন বাড়ীর সকলে আমাকে দেখিয়া আতঙ্কগ্রস্ত অবস্থায় কান্নাকাটি করিতে করিতে আমাকে জড়াইয়া ধরিল। মা বলিলেন এই ব্যস্ততার মধ্যে বাব -এর কথা মোটেই মনে ছিল না। আমাকে মা 'বাব' বলিয়া ডাকিতেন। বাড়ীর সর্বস্ব পুড়িয়া শেষ। কিন্তু ভগবান বুদ্ধের অনন্ত করুণায় আমি এই যাত্রা নিষ্ফলি পাইলাম। আর পাঁচ মিনিট দেরী হইলে আমি নিশ্চিত জীবন্ত দগ্ধ হইয়া যাইতাম। ফান্নুয়া গালা তাহার জীবনের শেষ মুহূর্তে রোগ শয্যায়া শায়িত অবস্থায় বিবেকের দংশনে বাধ্য হইয়া তাহার এই অপরাধ স্বীকার করে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া যায় বলিয়া শুনিয়াছিলাম।

(৫) এবার আমি রাজ্যমাটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র। থাকি স্কুল সংলগ্ন বোর্ডিং ঘরে। ঐ বোর্ডিং ঘরটি ছিল কাঠের Floor বাঁশের বেড়া ও তজ্জা ছাউনী। নিয়ম ছিল রাত্র ১০ টার পর কেহ পড়িতে পারিবে না এবং নিজ নিজ বিছানায় ঘুমাইতে হইবে। আমাদের বোর্ডিং ঘরের অতি নিকটেই ছিল পুলিশ Magazine (অস্ত্রাগার)। সেই রাত্রে ১০ টা বাজার কিছু পূর্বে হঠাৎ শুনিতেছি বার বার বন্দুকের বিকট শব্দ, অন্ধকার রাত্র, কোথায় বন্দুকের আওয়াজ হইতেছে প্রথমে ব্যাপারটা আমরা কেহই বুঝিতে পারি নাই। ঠিক পর মুহূর্তে আমার এক ছাত্র বন্ধু (Class friend) রেবতী রঞ্জন চাক্মা পায়ে গুলির আঘাত পাইয়া ভীষণ ভাবে ছট্ ফট্ করিতেছে এবং রক্তাপুত অবস্থায় বোর্ডিং ঘরের floor এ গড়াগড়ি করিতেছে। তখনই বুঝিতে পারিলাম কোন একজন বেপরোয়া ভাবে গুলি ছুড়িতেছে। তখন আমাদের বোর্ডিং Superintendent দুর্যোধন বড়ুয়া চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন “তোমরা যে যেদিকে পার পালাইয়া যাও”। সঙ্গে সঙ্গে কেহ আশ্রয় নিল স্কুল ঘরে কেহ জঙ্গলে, কেহ রান্না ঘরে, কেহ বোর্ডিং এ চুপ করিয়া আত্মগোপন করিয়া রহিল। এই

ভাবে ভোর চারটা পর্যন্ত যে যেখানে পারে অন্ধকার রাতে লুকাইয়া রহিলাম। আর শুনিতেছি শুধু বন্দুকের আওয়াজ, রাত্র তিনটার পর হইতে পুলিশ রাস্তায় টহল দিয়া বলিয়া যাইতেছে যেই লোকটা গুলি ছুড়িতেছিল সে ধরা পড়িয়াছে। অতএব আর ভয় নাই কেহ কোথাও লুকাইয়া থাকিলে বাহিরে চলিয়া আস ইত্যাদি। তারপর আমরা বাহির হইয়া পড়িলাম, এই ভাবে অনেকে লুকাইত স্থান হইতে বাহিরে আসিল, পরে দেখি আমি বোর্ডিং এ যে বিছানায় শুইতাম সেই জায়গায় এক হাত উপর দিয়ে আমার বাস্ত্র ও বাঁশের বেড়া ফুটো করিয়া রাইফেলের গুলি চলিয়া গিয়াছে। ঐ বিছানায় থাকিলে আমিও গুলিবিদ্ধ হইতাম। ভগবান বুদ্ধের অনন্ত করুণায় আমি এই বিপদ হইতেও রক্ষা পাইলাম।

সকাল হইলে সমস্ত ব্যাপারটা জানিতে পারিলাম। পূর্বোক্ত অস্ত্রাগারের একজন নেপালী বস্ত্র বাহাদুর থাপা নামক গ্রহরী কাজেরত কনষ্টবল এই হত্যালীলা সংঘটন করে। হঠাৎ তাহার নাকি সাময়িকভাবে মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটায় ফলে বেপরোয়া ভাবে ৬০/৭০ রাউন্ড রাইফেলের গুলি ছোড়ে। যার ফলে একজন কনষ্টবল গুরুতর ভাবে আহত হয়। Treasury তে কর্তব্যরত কনষ্টবল ঘটনাস্থলে মারা যায়। পার্বত্য চট্টগ্রামের Deputy Commissioner মিঃ সি, জি টিভেনসন I.C.S. ঐ হত্যাকারী কনষ্টবলকে ধরিতে যাইতে গিয়ে উক্ত পাগলা কনষ্টবলের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া গুরুতর ভাবে আহত হন। আমাদের ছাত্রদের মধ্যে পূর্বোক্ত রেবতী চাক্মার একটা পা প্রায় সম্পূর্ণ ভাবে দুই টুকরা হয়ে যায়, শেষ পর্যন্ত তাহার ঐ পাটী চন্দ্রঘোণা মিশনারী হাসপাতালে নিয়ে বাদ দিতে হইয়াছিল। এখানে উল্লেখ্য জনৈক পান্নালাল দেওয়ান নামে এক ছাত্র নিজের জীবনের প্রতি ভ্রক্ষেপ না করিয়া ঐ পরিত্যক্ত বোর্ডিং ঘরের ঘটনাস্থলে একাকী সারারাত্রি আহত রেবতীর রক্তস্রাব বন্ধ করিয়া দেওয়ার জন্য আশ্রয় চেষ্টা করিয়াছিল, যার ফলে রেবতী ঘটনাস্থলে মারা যায় নাই। সত্যই পান্নালাল দেওয়ানের পক্ষে এই দুর্জয় সাহসিকতা ও অকুণ্ঠ সেবাকার্য্য মানবতার দিক দিয়ে এক মহান নিদর্শন সন্দেহ নাই।

এই ঘটনার শিকার হিসাবে সাধারণ Public সহ মোট আহতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল প্রায় ৩৭ জন। উক্ত পাগলা কনষ্টবল বস্ত্র বাহাদুর থাপাকে বিচারে ১৪ বৎসর সশ্রম কারাদন্ড দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া শুনিয়াছিলাম।

(৬) এবার আমি চট্টগ্রাম Medical School এ ৩য় বর্ষের ছাত্র। ইতিহাস

প্রসিদ্ধ স্বাধীনতা সংগ্রামের ঘটনাবলীর মধ্যে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন একটি অন্যতম ঘটনা। এই ঘটনার দুই বৎসর পর চট্টগ্রাম শহরে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে একটা বিরাট সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা (Communal riot) হয়। এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে শুধু কাটাকাটি মারামারি চলিতেছিল। আমিও তখন উত্তেজিত মুসলমানের হাতে প্রায় শিকার হইয়া পরিয়াছিলাম। কোন রকমে নিজকে অহিন্দু পরিচয় দিতে সমর্থ হওয়ায় এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাই। শুনিয়াছিলাম -

হরিপদ ভট্টাচার্য নামে একটি কলেজের ছাত্র তাহার মায়ের প্রতি অপমান করার প্রতিশোধের জের নিয়ে তৎকালীন আসানুল্লা খান নামে একজন Police Inspector কে ফুটবল খেলার মাঠে বহু জনসমক্ষে Revolver এর গুলিতে হত্যা করে, এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ এই সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার সূত্রপাত হয়।

(৭) ১৯৩৫ ইংরেজী চট্টগ্রামে Medical School হইতে ডাক্তারী শাস্ত্র অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া ডাক্তার উপাধি লাভ করিলাম। তারপর এক বৎসর রাজামাটিতে Private Medical Practice করার পর ১৯৩৭ ইংরেজীতে মাসিক ৬০, ষাট টাকা বেতনে পার্শ্বত্যা চট্টগ্রামে বাজার ফান্ড (Bazar Fund) এ একটি চাকুরী লাভ করি। ঐ চাকুরী করার সময় এদিন আমি আমার Medical Carrier পক্ষীরাজ ত্রিপুরাকে সঙ্গে লইয়া রামগড় সাব ডিভিশন্ এর অন্তর্গত অযোধ্যা বাজার পরিদর্শনে যাইতেছিলাম। পাহাড়ী রাস্তা, দুই ধারে গভীর জঙ্গল। ঐ রাস্তা ধরিয়া দুইজনে চলিতেছি। অযোধ্যা বাজার পৌছিবার প্রায় মাইল দুয়েক আগে পক্ষীরাজ হঠাৎ রাস্তার উপর থামিয়া পরিল এবং আন্তে আন্তে আমাকে বলিতে লাগিল, ‘ঐ দেখ বাবু রাস্তার উপর একটা বিরাট হাতী’ সঙ্গে সঙ্গে আমিও হঠাৎ স্তম্ভিত অবস্থায় তাকাইয়া দেখি ‘আমাদের সামনে প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া একটা প্রকাণ্ড দন্তধারী হাতী গাছের ঝোপ টানিতেছে।’ আমরা ছিলাম হাতীর পেছন দিকে। সে আমাদের দেখিতে পাই নাই। তারপর আমরা ভয় বিহ্বল অবস্থায় দৌড়াইয়া পালাইয়া আসি। হাতী আমাদের দেখিতে পাইলে হয়ত আমরা সেদিন জীবন নিয়ে ফিরিয়া আসিতে পারিতাম না। আমার জীবনের উপর দিয়ে এটাও বয়ে গেল একটা মহাবিপদ, কেবল ভগবান তথাগতের অনন্ত করুণায় এই বিপদ হইতেও পরিত্রাণ লাভ করিলাম।

তদকালীন এই জায়গাটা নাকি বন্য হাতীর উপদ্রুত অঞ্চল বলিয়া পরিচিত ছিল।

(৮) তখন আমি পার্বত্য চট্টগ্রামে বড়কল নামক ছোট একটি হাসপাতালে কর্মরত। ১৯৩৮ ইং বাংলা ভাদ্র মাসের প্রথম তারিখ দুপুর ১২টার সময় হাসপাতালের কাজ সারিয়া আমার বড় মেয়ে লিলিকে সঙ্গে নিয়ে খাড়া দুই পাহাড়ের নীচে ছোট একটি ঝর্ণায় স্নান করিতে যাই। ঝর্ণার দুই ধারে উচু পাহাড় গভীর জঙ্গলে পরিপূর্ণ। দাঁড়াইয়া স্নান করার সুবিধার জন্য ঐ পাহাড় হইতে নির্গত জলস্রোতে একটি লম্বা লৌহার Pipe বসান ছিল। ঐ পাইপের দিক দিয়ে পিঠ রাখিয়া দাঁড়াইয়া লিলিকে স্নান করাইয়া দিতেছি, লিলির মুখ ছিল ঐ পাইপের দিকে। হঠাৎ লিলি চীৎকার করিয়া বলিল, “বাবা ওটা কি? আমি প্রথমে তাহার কথায় কর্ণপাত করি নাই। কিন্তু বার বার চিৎকার করিয়া বলাতে আমি মাথা উচু করিয়া পাইপের দিকে তাকইলাম। তখন দেখিতে পাইলাম ঠিক আমার মাথার উপর জলের পাইপ বেয়ে একটা প্রকাণ্ড খুস খুসে কাল সাপ ফণা তুলিয়া আমার মাথার দিকে হত বিহ্বল অবস্থায় এক দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছে। মনে হইল সেও আমাদের দেখিয়া কিংকর্তব্য বিমূঢ়, আমিও ভীষণ আতঙ্কগ্রস্ত অবস্থায় চিৎকার করিয়া লিলিকে সহ ঝর্ণার একধারে লাফ দিয়া পরিয়া যাই। আর দৌড়িয়া পালাইবারও সহজ উপায় ছিল না। সাপটি ততক্ষণ এক দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকাইয়া থাকায় পর আস্তে আস্তে গতি ফিরাইয়া জঙ্গলে প্রবেশ করে। আমরা পর মুহূর্তে অস্নাত অবস্থায় দৌড়াইয়া বাড়ী চলিয়া আসি।

সাপটি মনে হইল চাক্মা ভাষায় “কাল জামুরা” ভীষণ বিষধর সর্প, লম্বাই ছিল প্রায় ১০/১২ হাত। এই যাত্রাও অব্যাহতি পাইলাম ভগবান বুদ্ধের অনন্ত করুণায়। তখন আমার বড় মেয়ের বয়স দুই বৎসরও পূর্ণ হয় নাই।

(৯) ১৯৪৩ ইংরেজী। অবস্থান করিতেছিলাম মেসোপটেমিয়া বসরা শহরে। একদিন আমি সামরিক কাজে বসরা হইতে ট্রেন যোগে বাগদাদ যাইতেছিলাম, মাঝ পথে ‘উড়’ নামক একটা বড় Railway Station ছিল। ঐ জায়গাটা নাকি প্রথম মহা যুদ্ধের সময় একটা বড় রণক্ষেত্র ছিল। ঐ স্টেশনে আমি ভোর রাত তিনটার সময় ট্রেন হইতে অবতরন করি। তখন ছিল শীতকাল। ট্রেন হইতে নেমেই দেখি স্টেশনে কোন লোকজন নাই। কেবল এক ভদ্রলোককে দেখিতে পাইলাম, তাহার সাথে দুইটি ৭/৮ বৎসর বয়স্ক ছেলে। ভদ্রলোকের পোষাক পরিচ্ছদে ও কথাবার্তা শুনিয়া মনে হইল ঐ দেশীয় একজন রেল কর্মচারী হইবে। তখন শুনিতে পাইতেছি তাহারা তিনজনে আরবিক ভাষায় কথাবার্তা বলিতেছিল।

তারপর আমি ভদ্র লোককে ইংরেজীতে জিজ্ঞাসা করিলাম ‘মহাশয়’ আমাদের মিলিটেরী কেম্প কোন দিকে বোলতে পারেন? ভদ্রলোক উত্তর দিলেন ‘Go by this way, not far off, just out the Railway Station on the left side’

তারপর আমি ইংরেজীতে তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাইয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত । হই । ঠিক সেই মূহর্তে ভদ্রলোক আমাকে প্রশ্ন করিলেন ‘Are you an Indian? আমি উত্তর দিলাম ‘Yes, I am an Indian’ যেই মাত্র আমি ভারতবাসী বলিয়া উত্তর দিলাম তিনি সঙ্গে সঙ্গে খুব আগ্রহ সহকারে হিন্দিতে প্রশ্ন করিলেন ‘আপ হিন্দুস্থানী আদমী হাই’ হিন্দুস্থান মে কাঁহা সে আয়া? বাঙ্গাল বিহার U.P. পাঞ্জাব? ইত্যাদি । ভদ্রলোকের মুখে সুন্দর হিন্দি কথা শুনিয়া আমি একটু অবাক হইয়া গেলাম, কেননা এই বিদেশে একটু পূর্বে তাঁহার মুখে আরবিক কথাবার্তা শুনিয়া তাঁহার মুখ হইতে এত সুন্দর হিন্দি কথা আশা করিতে পারি নাই । আমার সাথে আলাপ করার পূর্বে ভদ্রলোকটির সঙ্গে এ দুইটি ছেলের সাথে আরবিক ভাষার কথা বলিতেছিলেন । তারপর আমিও হিন্দিতে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কি কোনদিন হিন্দুস্থানে (India তে) ছিলেন, উনি উত্তর দিলেন জরুর (নিশ্চয়ই) । তারপর আমি বলিলাম, “মে বাঙ্গাল সে আয়া ।” এই কথা শুনিয়া তিনি ফের আমাকে প্রশ্ন করিলেন ‘আপ বাঙ্গালী হায়?’ আমি উত্তর দিলাম ‘জে, মে বাঙ্গালী হাই’ ।

যেই মাত্র তিনি আমার উত্তর শুনিলেন সঙ্গে সঙ্গে ফের পরিষ্কার বাঙ্গালায় আমাকে প্রশ্ন করিলেন ‘বাঙ্গালা দেশে আপনার বাড়ী কোথায়? কলিকাতা, ঢাকা, না চট্টগ্রামে ইত্যাদি । তাঁহার মুখে পরিষ্কার বাঙ্গালা ভাষায় প্রশ্ন শুনিয়া আমি ততক্ষণ হত বিহ্বল অবস্থায় তাঁহার প্রতি ফেল ফেল ভাবে তাকাইয়া রহিলাম, তারপর আমি ইংরেজী ও হিন্দি ছাড়িয়া দিয়া পরিষ্কার বাংলা কথায় জিজ্ঞাসা করিলাম- আপনি কি বাঙ্গালী? বাঙ্গালা দেশে আপনার বাড়ী কোথায়?

তারপর তিনি উত্তর দিলেন, আমার বাড়ী চট্টগ্রাম রাজুনীয়া থানার অধীন, চন্দ্রঘোনার একটু নীচে । তাহার এই উত্তর শুনিয়া আমি বেশ আনন্দের সহিত বলিলাম ‘আমার বাড়ীও চন্দ্রঘোনার কিছু উপরে রাজামাটিতে’ তিনিও আমার এই কথা শুনিয়া আনন্দে লাফাইয়া উঠিলেন এবং খাঁটি চট্টগ্রাম ভাষায় আমার সঙ্গে নানা কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন । আমরা দুইজনেই চট্টগ্রামবাসী পরিচিত হইয়া আমাদের মর্দন ও

কোলাকোলি ও আলিঙ্গন আরম্ভ হইয়া গেল। তিনি আমার বায়োজ্যেষ্ঠ দেখিয়া হঠাৎ আমি তাঁহাকে দাদা বলিয়া সম্বোধন করিলাম। তারপর তিনি আমাকে চা-পানে আপ্যায়িত করিলেন।

তারপর তাঁহার সাথে আলাপ করিয়া জানিতে পারিলাম ভদ্রলোক চট্টগ্রামবাসী একজন মুসলমান। তিনি গত প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ১৯১৪ ইংরেজীতে এদেশে আসিয়া বৃটিশের পক্ষ হয়ে সংগ্রাম করেন পরে মিলিটারী চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া এ মেসোপটেমিয়ায় একটি ইরাকী মেয়েকে বিবাহ করিয়া এ দেশের নাগরিক হইয়া পড়েন। ইতিমধ্যে তিনি নাকি সস্ত্রীক ২/১ বার নিজবাড়ী চট্টগ্রামেও ঘুরিয়া আসিয়াছিলেন। সঙ্গে যে দুইটি ছোট ছেলেকে দেখিলাম এরা দুইটিই তাঁহার আপন ছেলে।

এই ঘটনা এখানে উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হইল বিদেশে হঠাৎ আপনজন কিম্বা নিজ দেশবাসীর সাথে দেখা সাক্ষাৎ ঘটিলে কি যে আনন্দ পাওয়া যায় তাহা এক ভুক্তভোগী ছাড়া অন্য কেহ বিশেষ উপলব্ধি করিতে পারিবে না। ইহা ব্যক্ত করার উদ্দেশ্যে বিশেষতঃ মিলনের পক্ষে ধর্মীয় কিম্বা প্রাদেশিক কিম্বা অন্য কোন প্রভাবের চেয়ে ভাষার প্রভাব যে অনেক শক্তিশালী ইহাও এক জ্বলন্ত উদাহরণ।

(১০) ১৯৪৫ ইংরেজী। আমি তখনও সামরিক কাজ হইতে অবসর গ্রহণ করি নাই। আমি কয়েক দিনের ছুটি লইয়া বাড়ী আসিয়াছিলাম। ছুটি অন্তে পুনঃ চাকুরীতে হাজির হওয়ার উদ্দেশ্যে কলিকাতা অভিমুখে হাজিরা হইতে রওনা দিলাম। তখন অবিভক্ত বাংলা Muslim Ministry'র under এ ছিল। ঐ সময় হিন্দু, মুসলমান, এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপক সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা (Communal Riots) চলিতেছিল। আমার চাকুরীর তাগিদে ঐ হাঙ্গামাকে অগ্রাহ্য করিয়া চট্টগ্রাম হইতে কলিকাতা ট্রেন যোগে আসিতে বাধ্য হইলাম। সাথে আমার ছিল একটি ট্রান্স ও একটি Bedding আমি Military পোষাকে সজ্জিত। কিন্তু ছুটি হইতে আসার কারণে সঙ্গে কোন আগ্নেয়াস্ত্র যেমন Revolver ইত্যাদি কিছুই ছিল না। সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার কারণে Train এর সময়টা ছিল বড় Irregular. ঐ দিন আমাদের Train Scheduled time সন্ধ্যা ৭টার সময় শিয়ালদহ স্টেশনে arrive না করিয়া রাত্রি ১০-৩০ মিনিটের সময় (সাড়ে দশটার সময়) আসিয়া পৌছিল। তারপর আমি ট্রেন হইতে অবতরণ করিয়া দেখি শিয়ালদহ স্টেশন প্রায় জনমানবশূন্য। গাড়ী ঘোড়া বলিতে কিছুই

নাই। একটু দূরে হঠাৎ চোখে পড়িল একটি ঘোড়ার গাড়ী। তখন আমি গাড়ীওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করিলাম ‘আমাকে নিতে পারিবে কিনা।’ আমার গন্তব্যস্থল ছিল Buddhist Hostel, বৌ-বাজার। তখন ঐ হোস্টেলে আমার এক শ্যালক শ্রীমান অশোক কুমার দেওয়ান, B.A. Class এর ছাত্র থাকিত। গারোয়ান সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল ‘হাঁ সাহেব নিতে পারিব, তবে বৌ-বাজার হিন্দু এলাকা বলিয়া আমি ধর্মতলা স্ট্রিট হয়ে এসপ্লেনেড হইয়ে আপনাকে আপনার জায়গায় লইয়া যাইব’। গারোয়ানটি ছিল মুসলমান। আমি তবুও সরল বিশ্বাসে মনে করিলাম সত্যই সে মুসলমান বলিয়া রাত্রে সে হিন্দু এলাকা হয়ে আমাকে লইয়া যাইতে সাহস পাইতেছে না। কাজেই আমি আর বিশেষ কিছু না বলিয়া তাহার কথায় রাজী হইলাম। বিশেষতঃ মনে করিলাম ‘আমি একজন Military Officer, আমাকে কে কি করিবে? এই ভাবিয়া আমি ঐ ঘোড়ার গাড়ীর উপর উঠিয়া বসিলাম। গারোয়ান ধর্মতলা হয়ে গাড়ী চালাইয়া নিতে লাগিল। পথে কোন লোকজন দেখিতে পাইতেছি না। কেবল কিছু দূরে লক্ষ্য করিলাম একজন পুলিশ প্রহরী ধর্মতলা রাস্তার উপর এদিক সেদিক ঘুরিয়া প্রহরীর কাজে টহল দিতেছে। আমার গাড়ী আসিল ওয়েলিংটন স্কোয়ারের মোড়ে অর্থাৎ ধর্মতলা ও ওয়েলসলী স্ট্রিটের Crossing এ। তখন দেখি গারোয়ান তাহার গাড়ী সোজা এসপ্লেনেডেন দিকে না নিয়ে Park Circus এর দিকে ঘুরিয়া লইয়া যাইতেছে। ঐ এলাকা মুসলমান প্রধান। তখন আমার মনে একটু সন্দেহের উদয় হইল। মনে মনে ভাবিলাম গারোয়ানের মনে নিশ্চয়ই একটা কু-অভিসন্ধি আছে। তারপর জিজ্ঞাসা করিলাম ‘তুমি গাড়ী ঐ দিকে লইয়া যাইতেছ কেন? এসপ্লেনেডের দিকে চালাও।’ কিন্তু সে আমার কথায় কর্ণপাত না করিয়া দ্রুত তাহার ইচ্ছামত গাড়ী পার্ক সার্কাসের দিকে লইয়া যাইতেছে! আমার বলা সত্ত্বেও যখন সে আমার কথা গ্রাহ্য করিতেছেনা তখন আমি ধপ করে গাড়ী হইতে নামিয়া ঘোড়ার লাগামটা ধরিয়া গাড়ীর সামনে দাঁড়াইলাম। গারোয়ান তখন তাহার হাতের লাঠি দিয়ে আমার পিঠে এক ঘা মারে। তারপর আমিও গারোয়ানের উপর ঝাপিয়ে পড়িলাম। তখন আমাদের দুই জনের মধ্যে আরম্ভ হইল ধস্তাধস্তি এবং শেষ পর্যন্ত অনেকটা মল্ল যুদ্ধ। আমার হাতে এ সময় Revolver থাকিলে তাহাকে ঐ স্থানেই গুলি করে মারিয়া ফেলিতাম। কিন্তু আমি নিরস্ত্র বলিয়া তাহা আর হইয়া উঠিল না। যখন আমরা মল্ল যুদ্ধে লিপ্ত তখন হঠাৎ একজন Police Officer হাতে Reolver নিয়ে আমাদের নিকট হাজির। তখন আমি ইংরেজীতে সব ব্যাপারটা বলিলাম। তিনি আমাকে Military Officer দেখিয়া যথোচিত সম্মান দেখাইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন আমি কোথায় যাইব। আমি বলিলাম ‘আমি বৌ-বাজারস্থিত

Buddhist Hostel এ যাইব' তখন তিনি গারোয়ানের গালে বেশ জোরে কয়েকটা চর মারিয়া গারোয়ানের বুকের কাছে Revolver উচাইয়া ধরিয়া বলিতে লাগিলেন 'এই রাস্তা দিয়া গাড়ী চালাও।' তখন গারোয়ান ভয়ে দ্রুত হয়ে ঐ Police Officer এর নির্দেশমত আর কোন কথা না বলিয়া গাড়ী চালাইতে আরম্ভ করিল। ঐ পুলিশ অফিসার রাত্রি বারটার বিদায়কালীন তিনি আমাকে 'Good Night Sir' বলিয়া তাঁহার কর্মস্থলে চলিয়া গেলেন। আমিও তাঁহাকে Many Thanks বলিয়া বিদায় দিলাম।

উক্ত পুলিশ অফিসারের মহান মানবিকতা আমার জীবনে ভুলিতে পারিব না। এবং আমি তাঁহার প্রতি চির কৃতজ্ঞ। ঐ মুসলমান গারোয়ানটি আমাকে অমুসলমান দেখিয়া সাম্প্রদায়িকতার জের নিয়ে আমাকে হয়ত হত্যা করার উদ্দেশ্যে ঐ মুসলমান এলাকায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করিয়াছিল।

ভগবান বুদ্ধের অশেষ করুণায় আমার জীবনের উপর দিয়ে ইহাও একটা মস্ত বড় বিপদ কাটিয়া গেল। এছাড়াও আরও কয়েকটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল কিন্তু পুস্তিকার কলেবর বড় হয় দেখিয়া এ সব ঘটনা আর লিপিবদ্ধ করিলাম না, তবে একটা হাস্যকর ঘটনা যাহা ঘটিয়াছিল যখন আমি একবার কিছুটা ছলনা প্রয়োগ করিয়া সাময়িক বিপদ হইতে নিজেকে কিছুটা রক্ষা করার উদ্দেশ্যে প্রয়াস নিয়াছিলাম, তাহা অপ্রাসঙ্গিকভাবে নিম্নে বর্ণনা করিতেছি, যেমন-

১৯৪১ ইংরেজী সেপ্টেম্বর মাস অর্থাৎ আমি over seas (Egypt এ) যাওয়ার এক মাসের মধ্যে বেশ কয়েকবার বিমান আক্রমণের প্রচণ্ড সংগ্রাম ও বিভীষিকাময়ী বোমা বর্ষণের সম্মুখীন হইলাম যাহার ফলে জীবন নিয়ে বাড়ী ফিরিয়া আসার সম্ভাবনা খুব কমই মনে হইতেছিল। তাই একদিন চিন্তা করিতেছিলাম কি উপায়ে এই অনিবার্য মৃত্যুর করাল কবল হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। অনেক চিন্তার পর স্থির করিলাম 'একবার চেষ্টা করিয়া দেখি যদি Medical Specialist এর দ্বারা আমার Category বদলাইয়া নিতে পারি অর্থাৎ 'A' শ্রেণীভুক্ত হইলে পৃথিবীর যে কোন জায়গায় যে কোন যুদ্ধ ক্ষেত্রে কাজ করার যোগ্য। আর আমি ছিলাম ঐ 'A' শ্রেণীভুক্ত। তবে যদি 'B' কিংবা 'C' শ্রেণীভুক্ত হওয়া যায় তাহা হইলে তাহারা ভারতের ভিতর থাকিবে এবং যেখানে যুদ্ধ বিগ্রহ নাই সেই Peace Zone এ কাজ করিবে এই ছিল তৎকালীন নিয়ম। অতএব আমি 'B' কিংবা 'C' শ্রেণীভুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে একজন খাস Eurobean (Britisk) Medical Speciallst এর নিকট গেলাম। তাঁহার

Rank ছিল কর্ণেল। তিনি ঐ এলাকার Medical Department এর সর্বোচ্চ Medical Officer. তাহার শরীরের রং টকটকে লাল খুব সুন্দর চেহারা, বলিষ্ঠ এবং মনে হইল উচ্চতায় প্রায় ৬/৭ ফুট হইবে। মনে মনে চিন্তা করিতেছি যদি B শ্রেণীভুক্ত হইতে পারি তাহা হইল আমাকে সহসা ভারতে ফেরৎ পাঠাইবে। এই আশা ও নিরাশার ভাব নিয়ে উক্ত কর্ণেল সাহেবের অফিস ঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া বলিলাম -

May I come in Sir?

তিনি উত্তর দিলেন - Yes, come in.

তারপর আমি ভিতরে ঢুকিয়া খুব Smartly একটা Salute

দিয়া বলিলাম - Good morning Sir.

সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলিলেন - Yes. good morning?

What can I do for you?

আমি বলিলাম Sir, for the last days, I have been feeling that my health is gradually running down, so I have come to you for medical check up. will you please examine me?

তারপর তিনি বলিলেন - Oh yes, Why not, take your seat here.

একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমাকে পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন এবং এক একটা প্রশ্ন করিতে লাগিলেন।

যেমন, প্রঃ- How long you are in overseas?

উঃ- Sir, For the last one month.

প্রঃ- Have you ever met Bombing?

উঃ- Yes Sir, For so many times.

প্রঃ- Are you married?

উঃ- Yes Sir, I am married.

প্রঃ- How many children you have got?

উঃ- Three children Sir.

এই ভাবে প্রায় আধাঘন্টা পরীক্ষা করার পর তিনি বলিতে লাগিলেন 'Doctor! You are perfectly alright. There is nothing wrong in your systems, but you are very nervous and not fit for Military Service. আমি এই কথা শুনা মাত্রই মনে মনে একটু খুশী হয়ে বলিতে লাগিলাম -

Yes Sir, I also think that I am not fit for Military Service. So, you please either make me unfit or put me in Category B or C. তিনি আমার মুখ হইতে এই কথা শুনার সঙ্গে সঙ্গে খুব জোরের সহিত বলিতে লাগেলেন-No. No.Doctor ! I can not make you unfit You must make your self fit.

ফের প্রঃ- Do you Drink?

উঃ- No, Sir.

প্রঃ- Do you smoke?

উঃ- No Sir.

তারপর তিনি আমার এ উত্তর শুনিয়া বলিতে লাগিলেন -

It is very bad of you. How is it? You neither drink nor smoke, then how can you pull on in this warfield?

তারপর তিনি উপদেশ দিতে লাগিলেন -

I advise you Doctor, just from to day, you start with drinking and smoking and forget your wife and children and enjoy your life. I tell you Doctor, the very day, you joined the Army, you should have thought that you are no more in this world. You are already killed. You are feeling too much of home sickness. You just follow my advice otherwise you can't pull on. Don't forget that we are now In the battle field.

Medical Specialist এর নিকট হইতে এই উপদেশ লাভ করিয়া মনে মনে একটু হতবাক হইয়া গেলাম এবং ভাবিলাম আমি unfit হওয়ার আশা নিয়ে যে এখানে আসিলাম তার বদলে এই উপদেশ লাভ করিলাম? পরে আমি একটু হতাশ হইয়া নিজ কর্মক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিলাম ।

এই ক্ষুদ্র উপাখ্যান হইতে সামরিক জীবন সম্বন্ধে কিছুটা উপলব্ধি করা যাইবে । এই প্রসঙ্গে আর একটি ক্ষুদ্র ঘটনা উল্লেখ করিতেছি । আমি ১৯৪১ সালে মিশোরে (Egypt) একটি ইটালীয়ান বন্দী শিবিরে (Italian Prisoners' Camp এ) কাজ করিতেছিলাম, তখন একজন ইটালীয়ান বন্দী সৈনিক আমার M.I. Room এ

(Medical Inspection Room এ) আমাকে কাজে সাহায্য করিত এবং সে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজীতে আমার সাথে নানা গল্প করিত । সকালে M.I. Room এ প্রবেশ করিয়া আমাকে বলিত -

Good morning Doctor,

আমিও সাড়া দিতাম -Yes' good morning.

তারপর সে বলিতে থাকে - Indian very good.

Indian doctor very good.

British no good

British doctor no good.

Churchil - very bad.

Hitler - very good.

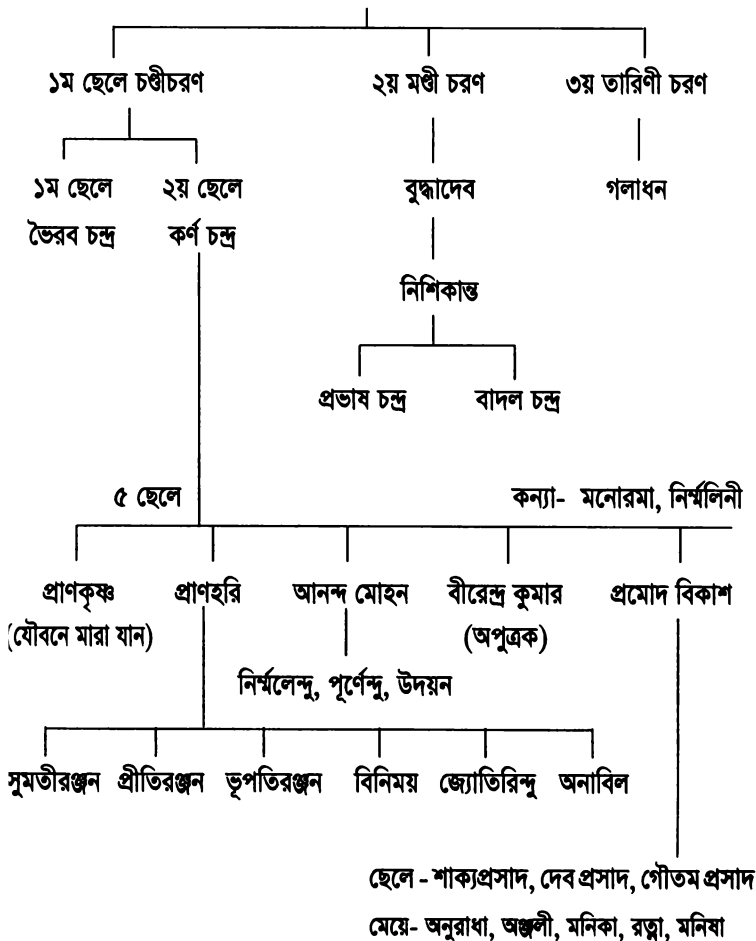
Mussolini - very good. ইত্যাদি ইত্যাদি

এইসব পাগলের প্রলাপের ন্যায় সে অনর্গল বলিয়া যাইতে থাকে- বৃটিশ সৈনিক দেখিলেও সে কোন গ্রাহ্য করিত না । পকেট হইতে একটি ফটো বাহির করিয়া আমাকে দেখাইয়া বলে -See, My Wife. My Son, My Daughter, Not seen 5 years. 1936 fighting, fighting fighting 1941 caught, Not seen 5 years. এই বলিতে বলিতে ঐ ফটোটি বুকে জড়াইয়া ধরিত এবং চুশন করিত । এই ভাবে সে তাহার দীর্ঘদিনের প্রিয়জনের সাথে বিচ্ছিন্নতার মর্ম বেদনায় ব্যাকুলিত হয়ে, তাহার অন্তরের গভীরতম কোন হইতে মর্মস্পর্শী করুণ দৃশ্য ঐ তাহার আধ আধ ইংরেজীর মাধ্যমে আমার কাছে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিত যেহেতু সে ভাল ইংরেজী জানিত না । আমি কিন্তু তাহার কথার অর্থ কিছুটা বুঝিতে পারিতাম ।

তাহার এই করুণ দৃশ্য দেখিয়া আমি মনে মনে ভাবিতাম -‘তুমি যুদ্ধ বন্দী হইয়াছ বলিয়া আজ তোমার এই অবস্থা’ আমিও ত যুদ্ধ ক্ষেত্রে যে কোন মুহূর্তে যুদ্ধ বন্দী হইতে পারি । অতএব, আমার অবস্থাও যে তোমার মত না হইবে কি করিয়া বলি । ইত্যাদি চিন্তা করিতাম এবং মনে মনে বলিতাম সংসারে মায়াজাল বড় কঠিন ‘এই লোকটা যুদ্ধ বন্দী হইয়াও সে তাহার প্রাণ প্রতীম স্ত্রী, পুত্র, কন্যার কথা ভুলিতে পারে নাই এবং এই ফটোর মাধ্যমে সে তাহার প্রিয়জনের স্নেহানুভূতি কিছুটা উপলব্ধি করে এই ফটোকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া ও চুশন করিয়া । এই দুঃসময়ে ইহাই তার একমাত্র শান্তি ।

আমার পিতৃকুল দিয়ে যতদূর স্মরণ করা যায় সংক্ষিপ্ত বংশাবলী

কালচাঁদ তালুকদার (রাঁস্কা গোজার নেতা)



আমার মাতৃকুল দিয়ে সংক্ষিপ্ত পরিচয়

আমাদের চাকমা রাজবংশে রাজা ধরম বক্স খাঁর সহধর্মিণী রাণী কালিন্দী ছিলেন একজন সুপ্রসিদ্ধা মহিলা। তাঁহার স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি দীর্ঘদিন দক্ষতার সহিত রাজকার্য্য পরিচালনা করার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁহার পিতার নাম গুজাং চাকমা (কুড়া খুটা) পরে তিনি রাজা ধরম বক্স খাঁ কর্তৃক প্রদত্ত দেওয়ান উপাধীতে ভূষিত হন। রাণী কালিন্দীর পিতৃপ্রদত্ত নাম ছিল কালাবী। পরে রাজ মহিষীর মর্যাদা লাভ করার পর তাঁহার নামকরণ করা হয়। “কালিন্দী”। এই রাণী কালিন্দীর “জয় মুনী” নামে এক ছোট ভাই ছিল। এই জয় মুনী দেওয়ানের ছিল যথাক্রমে কন্যা রম্ভাবতী -ছেলে (১) চন্দ্র ধর (২) চন্দ্র কান্ত। আমার মা এই জয় মুনী দেওয়ানের ছেলের ঘরের নাতিনী যেমন নিম্নরূপ :-

A. রম্ভাবতীর বিয়ে হয় ধামাই গোজা জয় চন্দ্র দেওয়ানের সহিত। জয় চন্দ্র দেওয়ানের ছেলে ত্রিলোচন ও পদ্মলোচন। ত্রিলোচন দেওয়ানের ছেলে কামিনী মোহন (চাকমা নেতা) মদনমোহন, লালমোহন ও বিরাজ মোহন। এই বিরাজ মোহন দেওয়ান চাকমা জাতীর “ইতিবৃত্তি” একটা বই লিখিয়াছিলেন। মেয়ে কোমলাঙ্গিনী, সরলা বালা (আমার স্বশুরী) কনকলতা ও মাধবীলতা (ইনি ডাঃ নির্মল চন্দ্র দেওয়ানের সহধর্মিণী)

B. চন্দ্রধর দেওয়ানের মেয়ে -তারকা- আমার বড় মা ও কমল মুখী আমার আপন মা। ছেলে- দুর্গা কিঙ্কর ও কালীকিঙ্কর। আমার বড় মার ছেলে- প্রাণ কৃষ্ণ, প্রাণ হরি, ও আনন্দমোহন তালকদার। আর আমার আপন মার - বীরেন্দ্র কুমার, মনোরমা, নির্মলিনী ও প্রমোদ বিকাশ- আমি নিজে।

C. চন্দ্র কান্ত দেওয়ানের বড় মেয়ে রত্না মুখী -ধামাই গোজা মধুসূদন দেওয়ানের সহিত বিয়ে হয়। ছোট মেয়ে দয়াময়ী -তাঁহার, রাজা ভুবন মোহন রায়ের সহিত বিবাহ হয়। তাঁহার গর্ভজাত সন্তান :-মেয়ে বিজন বালা। চাকমাদের মধ্যে প্রথম graduate যামিনী কুমার দেওয়ানের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ছেলে রাজা নলিনাক্ষ রায় ও বীরুপাক্ষ রায়। রাজা নলিনাক্ষ রায়ের ছেলে ত্রিদিব রায় (বর্তমানে পাকিস্তানে) ত্রিদিব রায়ের ছেলে - দেবাশীষ রায়। বর্তমান চাকমা রাজা।

উপরোক্ত রাণী দয়াময়ী হইলেন আত্মীয়তা সূত্রে আমার মার আপন খুরতুত বড় ভগিনী।

আমার স্বস্তর কুলের দিক দিয়ে পরিচয়

আমার স্বস্তর মহাশয়ের নাম শ্রীমদনমোহন দেওয়ান। ইনি আমাদের চাকমা সমাজে প্রথম ডাক্তার। তাঁহার বাবার নাম ছিল লক্ষীধন দেওয়ান। ইনি রাজা ভূবন মোহন রায়ের বাবা রাজা হরিশ চন্দ্র চৌধুরীর শ্যালক। আমার স্বস্তর মহাশয়ের দুই মেয়ে ও তিন ছেলে। সর্ব্ব জ্যেষ্ঠা কন্যা প্রতিভা আমার সহধর্ম্মিনী। ২য় কন্যা লতিকা। রাজা ভূবন মোহন রায়ের সর্ব্ব কনিষ্ঠ ছেলে দিবাক্ষ্য রায়ের সহিত লতিকার বিবাহ হয়।

আমার স্বস্তরের ছেলে যথক্রমে (১) প্রদ্যোৎ চন্দ্র (২) প্রমোদ চন্দ্র ও (৩) সৌমেশ চন্দ্র দেওয়ান।

আমার ভাবী বংশধরের মধ্যে পরিচিতি রক্ষার উদ্দেশ্যে আমার তিন কুলের সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়া গেলাম। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি রাজা ভূবন মোহন রায়ের প্রথম মহিষী রাণী দয়াময়ী হইলেন আমার মার আপন খুরতুত বড় ভাগিনী। সেই সূত্রে আমার মা হইলেন রাজা ভূবন মোহন রায়ের ছোট শ্যালিকা। সেই কারণে মা অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছিলেন বলিয়া রাজা বাহাদুর প্রতি বৎসর পূণ্যাহ উপলক্ষে মা কে কিছু আর্থিক সহায়তা করিতেন। ঐ টাকাতে মার প্রায় সারা বৎসরের পরিধেয় বস্ত্রাদি খরিদ করা চলিত। ছোট বেলায় মার সাথে প্রত্যেক বৎসর পূণ্যাহ উপলক্ষে রাজবাড়ী যাইতাম। সেই কারনে তখন হইতে আমার রাজ পরিবারের লোকদের সাথে অনেকটা ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচয় ছিল। একটা কথা আমার এখনও মনে আছে, একবার আমি মার সাথে রাজ বাড়ী গিয়াছিলাম। তখন আমি স্কুলে পড়ি। ঐ সময় আমি রাজা বাহাদুরকে পা স্পর্শ করিয়া প্রণাম না করিয়া দণ্ডবৎ অবস্থায় হাত জোড় করিয়া নমস্কার জানাইয়াছিলাম -তখন সঙ্গে সঙ্গে রাজা বাহাদুর মাকে বলিলেন, 'কমলমুখী, তুমি এই কুকী ছেলেটিকে কোথায় পাইয়াছ? ওকে সহসা স্কুলে ভর্তি করিয়া দাও। মা আমাকে মৃদু তিরস্কার করিলেন এবং গুরুজনকে কিভাবে প্রণাম করিতে হয় বুঝাইয়া দিলেন।

চাকমা সমাজতন্ত্র ও শিক্ষার ক্রমবিকাশ

আমার বাল্যকালে আনুমানিক ১৯১৫-১৬ ইংরেজী হইতে আমি চাকমা সমাজে যাহা দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি সে বিষয়ে বর্তমান চাকমা সমাজে কিছু আলোকপাত করার উদ্দেশ্য নিয়ে এই ক্ষুদ্র বিবৃতির মাধ্যমে কিছু স্মারকলিপি রক্ষাকল্পে প্রয়াসী হইলাম।

ঐ সময়ে সমস্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাটি তিনটি বিভিন্ন সার্কেলে বিভক্ত ছিল, যেমন চাকমা, বোমাং ও মং সার্কেল। এই তিন সার্কেলে যথাক্রমে চাকমা সার্কেলে চাকমা রাজা, বোমাং সার্কেলে বোমাং রাজা ও মং সার্কেলে মান রাজা বৃটিশ সরকারের অধীনে থাকিয়া স্ব স্ব সার্কেলের উপর রাজত্ব করিতেন। অবশ্য চাকমা রাজবংশ বহু প্রাচীন এবং এই রাজবংশের ধারাবাহিক স্বাধীন রাজত্ব বহু শতাব্দী পূর্ব হইতে চলিয়া আসিতেছিল। আমি কেবল আমার বাল্যকালে দেখা চাকমা রাজা ভূবন মোহন রায়ের সময় হইতে এই বিবৃতি লিপিবদ্ধ করিতেছি। শুনিয়াছি স্বনাম ধন্য চাকমা রানী কালিন্দীর সময় রাজবাড়ী ছিল চট্টগ্রামের অন্তর্গত রাজনগরে, পরে ঐ রাজবাড়ী রাজ্যমাটিতে কর্ণফুলী নদীর পূর্ব তীরে স্থানান্তরিত করা হয়। রাজা ভূবন মোহন রায়ের পিতা রাজা হরিশ চন্দ্র চৌধুরী যখন পরলোক গমন করেন তখন ভূবন মোহন ছিল অপ্রাপ্ত বয়স্ক, অতএব তাহার রাজ্য পরিচালনার ভার ন্যস্ত হইল তৎকালীন চাকমা নেতা রায় সাহেব কৃষ্ণচন্দ্র দেওয়ানের উপর। তিনি ছিলেন বৃটিশ সরকারের অধীনে Sub Deputy Magistrate এবং কার্য্যত চাকমা রাজা, এই কারণে তিনি ছিলেন একজন বিশেষ ক্ষমতাসালী ব্যক্তি। ইনি নিজ কৰ্ম দক্ষতার গুণে বৃটিশ সরকার হইতে রায় সাহেব উপাধী লাভ করেন।

আমাদের চাকমাদের মধ্যে গোজা ও গুঠি ভাগ আছে এবং প্রত্যেক গোজাতে একজন করিয়া নেতা থাকে এবং তাহাকে বলা হয় দেওয়ান বা তালুকদার। এই দেওয়ান, তালুকদার উপাধি চাকমা সমাজে পুরুষানুক্রমে বহু প্রাচীন যুগ হইতে চলিয়া আসিতেছিল। ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে আমার সঠিক মতামত প্রকাশ করার মত ক্ষমতা নাই। তবে ইহারা এক একটা তালুকরূপে গণ্য করা হইত, যেমন রাজেই তালুক, ধামাই তালুক, লার্মা তালুক ইত্যাদি। ইহা হইতে তালুকের উৎপত্তি। কিন্তু দেওয়ানরা রাজ কর্মচারী ছিলেন বলিয়া মনে হয়।

সুষ্ঠুভাবে রাজ কার্য পরিচালনার জন্য চাকমা রাজা এই দেওয়ান ও তালুকদারদের কিছুটা শাসন ক্ষমতা দিয়া দিতেন এবং প্রকৃতপক্ষে তৎকালে তাহারাই ছিল নিজ নিজ গোজার লোকদের উপর স্থানীয় শাসক বা দলনেতা বা গোজা নেতা বলা যেতে পারে। তাঁহারাই রাজার পক্ষ হয়ে শাসন কার্য কিছুটা পরিচালনা করিতেন এবং তাহাদের শাসন কার্যে সহায়তা করার জন্য রাজা প্রদত্ত উপাধীধারী কিছু লোক থাকিতেন, তাঁহাদের বলা হয় খীসা বা কার্বারী। তাঁহারাও রাজার পক্ষ হয়ে নিজ এলাকা মধ্যে কিছুটা শাসন কার্য পরিচালনা করিতে পারিতেন। মনের হয় তৎকালে শাসনের সুবিধার্থে গোজা হিসাবে লোক ভাগ ছিল এবং গোজার নেতাই ছিল নিজ গোজার অন্তর্ভুক্ত লোকদের উপর রাজার পক্ষ হয়ে শাসক।

নিম্নে কয়েকটি গোজা ও তাহাদের নেতার নাম উল্লেখ করিলাম যথা :-

গোজার নাম	নেতার নাম
১। রাঙ্গা গোজা	কর্ণ চন্দ্র তালুকদার (আমার বাবা)
২। বগা গোজা	সূর্য্যচন্দ্র তালুকদার
৩। বাবুর গোজা	অক্ষয় মুনি তালুকদার
৪। লক্ষর গোজা	পঞ্চরাম তালুকদার
৫। পেজাং ছিড়ি	চিকনা তালুকদার
৬। ধামাই গোজা	কামিনী মোহন দেওয়ান
৭। কুড়া খুট্যা	দুর্গাকিঙ্কর দেওয়ান
৮। বড় বুয়া গোজা	ভৈরব চন্দ্র দেওয়ান
৯। মুলীমা গোজা	রাজচন্দ্র দেওয়ান
১০। লার্মা গোজা	যুবরাজ দেওয়ান
১১। খেংজী গোজা	নীলচন্দ্র দেওয়ান
১২। ওয়াংজা গোজা	ইন্দ্রজয় দেওয়ান
১৩। তেয়া গোজা	অবিরত মোহন দেওয়ান
১৪। তৈন্যা গোজা	কৃষ্ণ কিশোর দেওয়ান
১৫। কাষে গোজা	দুঃস্মৃত্য তালুকদার

এছাড়া ও বুং গজা, লেবা, ফাক্ছা, দৌর্যা, ওইয়া, ফেমা ও বড়চেগগ উচ্চরী, কুদুক, গোজা ইত্যাদি ।

যতদিন চাক্‌মারা ব্টিশ শাসনাধীন ছিল ততদিন পার্বত্য চট্টগ্রাম ছিল একটা Excluded area. Directly বাঙ্গালা গভর্নরের শাসনাধীনে, কোন দিন অবিভক্ত বাঙ্গালার মন্ত্রীর শাসনাধীন ছিল না ।

উপরোক্ত রায় সাহেব কৃষ্ণচন্দ্র দেওয়ান যখন চাক্‌মা রাজা ভুবন মোহন রায়ের নাবালকত্বের সময় রাজকার্য্য পরিচালনা করিয়া দিতেন প্রচলিত গোজা হিসাবে লোক ভাগ করিয়া ‘শাসন পদ্ধতি’ উচ্ছেদ করিয়া দিলেন এবং দলনেতাদের মধ্যে মাটি ভাগ করিয়া দিয়ে মৌজা সৃষ্টি করিলেন । ইহাতে শাসন কার্য্যে অনেক সুবিধা হইল কেননা পূর্বোক্ত লোক ভাগ প্রথাতে শাসনে কিছু অসুবিধা ছিল । কারণ এক গোজার অন্তরভুক্ত সমস্ত লোককে এক জায়গায় রাখিয়া দেওয়া সম্ভব নয়, মৌজা সৃষ্টি হওয়ার ফলে সমগ্র চাক্‌মা সার্কেলটা কয়েকটি মৌজায় বিভক্ত হইয়া গেল । এই মৌজার সীমার ভিতর গোজাগুলি নির্বিশেষে যে বাস করিবে সে হইবে ঐ মৌজার দেওয়ান বা তালুকদারের প্রজা । হয়ত একটি মৌজার ভিতর ১০০টি গ্রাম পড়িয়া গেল । ঐ একশটি গ্রামের উপর উক্ত মৌজার দেওয়ান বা তালুকদার শাসন কার্য্য পরিচালনা করিতেন ।

ভুবন মোহন প্রাপ্তবয়স্ক হইলে, রায় সাহেব কৃষ্ণচন্দ্র দেওয়ান, তাঁহার হাতে শাসনভার তুলিয়া দিলেন । ভুবনমোহন রাজ কার্য্যে অভিষিক্ত হওয়ার পর, পিতার উপাধি ‘চৌধুরী’ পরিবর্তে ‘রায়’ উপাধি ধারণ করেন । তারপর হইতে রাজবংশে রায় উপাধি চলিয়া আসিতেছে । আমি আমার বাল্যকাল হইতে ডাক্তার হওয়া পর্য্যন্ত রাজা ভুবনমোহন রায়কে দেখিয়া আসিতেছিলাম । তিনি দেখিতে সুপুরুষ ও গাভীর্য্য পূর্ণ এবং তাহার চেহারায় একটা আভিজাত্যের ছাপ বিরাজমান । তিনি ১৯১১ ইংরেজী ১২ ডিসেম্বর সম্রাট পঞ্চম জর্জের ভারতের অন্যান্য দেশীয় নৃপতিগণের সহিত সমমর্য্যাদা লাভ করিয়া আমন্ত্রিত হন এবং উক্ত দরবারে মর্য্যাদা সহকারে যোগদান করেন, তাঁহার সাথে যাহারা গিয়াছিলেন অন্যান্যদের মধ্যে আমার মামা দুর্গাকিঙ্কর দেওয়ানও একজন ছিলেন ।

রাজ্যমাটি কর্ণফুলী নদীর পূর্ব পারে যে একটা প্রকাণ্ড রাজপ্রাসাদ ছিল উহা রাজা ভুবনমোহন রায় নির্মান করেন । তখন পার্বত্য চট্টগ্রামে ছিল দ্বৈত শাসনতন্ত্র (Dual

administration) অর্থাৎ চাকমা রাজা নিজ সার্কেলের অভ্যন্তরে সামাজিক প্রথানুযায়ী আভ্যন্তরীণ প্রশাসন চালাইতেন এর উপরে ছিল বৃটিশ শাসন। চাকমা রাজার ছিল নিজস্ব আমলাতন্ত্র, আদালত, পুলিশ, থানা ইত্যাদি। ফৌজদারী মামলা হইত বৃটিশ কোর্টে, আর বাদবাকী সব বিশেষভাবে জাতীয় বিচার হইত চাকমা রাজ আদালতে। রাজ কর্মচারীদের মধ্যে ছিল হিন্দু, বড়ুয়া ও চাকমা ইত্যাদি।

তখনকার দিনে চাকমা ও অন্যান্য পাহাড়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে জুম চাষ ছিল প্রধান জীবিকা, জমি চাষও ছিল সামান্য পরিমাণে। এছাড়া কট্টন অর্থাৎ সরকারী সুরক্ষিত বনাঞ্চল (Reserved forest) হইতে গাছ ও বাঁশ কাটিয়া ব্যবসা করা চাকমাদের জীবিকা অর্জনের একটা বিশেষ অঙ্গ ছিল। এছাড়া অন্যান্য ব্যবসা নাই বলিলে চলে। জুমের খাজনা বাৎসরিক জুম প্রতি ছিল ৬ ছয় টাকা। এই ছয় টাকা হইতে চাকমা রাজা পাইতেন ৪.০০ চার টাকা ও বাকী ২.০০ দুই টাকা দেওয়ান তালুকদারেরা পাইত। কিন্তু জমির খাজনা সম্পূর্ণ বৃটিশ সরকারের তহবিল যাইত।

প্রতি মৌজার মধ্যে দেওয়ান ও তালুকদারেরা ছিল স্থানীয় শাসক। প্রজাদের সুখ দুঃখ ও অন্যান্যসব বিষয়ে দৃষ্টিপাত করা ছিল তাঁহাদের প্রধান কর্তব্য। তাঁহাদের নিজস্ব আদালতে ছোটখাটো মামলার বিচার করিতে পারিতেন বিশেষভাবে জাতীয় বিচার অর্থাৎ পুরুষ ও মেয়েদের মধ্যে যদি অবৈধ প্রণয় সংঘটিত হইয়া কোন মোকদ্দমা উদ্ভূত হয় তাহাকে বলে চাকমা ভাষায় সীনালা মোকদ্দমা বা জাতীয় বিচার। এই বিচার হয় প্রাথমিক পর্যায়ে দেওয়ান বা তালুকদারের আদালতে। যদি কোন কারণে এই আদালতে চূড়ান্ত মীমাংসা না হয় তাহা হইলে দেওয়ান তালুকদারেরা ঐ মামলা রাজ আদালতে পাঠাইয়া দিতেন। কিন্তু সীনালা মোকদ্দমা (জাতীয় বিচার) বৃটিশ সরকারের করা কোন অধিকার ছিল না। অপরাধীর প্রতি দেওয়ান তালুকদারেরা অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী শাস্তি বিধান করিতেন যেমন 'শুকর দেওয়া' ইহা চাকমা সমাজে একটা বড় নিন্দনীয় সাজা-এই সাজাতে অপরাধীকে বিচারের নির্দেশ অনুযায়ী একটি পাঁচ মুট্যা বা ছয় মুট্যা (মুট্যা অর্থ মুষ্টি অনুসারে একটি শুকরকে মাপ বার প্রথা) শুকর ক্রয় করিয়া সমস্ত গ্রাম বাসীদের একটি ভোজ দেওয়া। এছাড়াও বিচারে অর্থ দণ্ড হইতে পারে। দেওয়ান তালুকদারেরা উর্দ্ধ সংখ্যায় ৫০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করিতে পারিতেন। এছাড়াও অন্যান্য শাস্তি বিধান আছে। আর নিয়ম ছিল প্রতি বৎসর ৭ (সাত) দিনের

জন্য প্রত্যেক পরিবার হইতে একজন লোককে বিনা পারিশ্রমিকে শ্রমদান করিতে হইত দেওয়ান তালুকদারের বাড়ীতে। ইহাকে বলা হয় বেকার খাটা। অবশ্য ইহা ছিল নিরক্ষরের উপর প্রযোজ্য। আরও নিয়ম ছিল- যদি গ্রামে কোন লোক পল্লান (শিকারী) বন্য হরিণ বা বড় রকমের পশু শিকার করে তাহা হইলে ঐ শিকারের একটা উরু অংশ (রান) ঐ দেওয়ান কিংবা তালুকদারের বাড়ীতে সম্মান স্বরূপ দিতে হইত। পল্লান পাইবে মাথা (শিং সহ), চামড়া পিঠের বড় অংশ চাক্মা কথায় বলে বুং। এছাড়াও সে পাইবে বন্দুকের জন্য একটি অংশ। বাদবাকী শিকারটা সমস্ত গ্রামবাসীদের মধ্যে সমান অংশে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। ইহাকে বলে ঘরভাগ- তাহাছাড়াও আছে জনভাগ অর্থাৎ ঐ ভাগ ভাগীর সময় যাহারা উপস্থিত থাকিবে তাহারা প্রত্যেকেই একটা অংশ পাইবে - ইহাকে বলে জনভাগ। এই শিকার বাজারে বিক্রি করার নিয়ম ছিল না।

খীসা ও কারবারীরা নিজস্ব এলাকার মধ্যে যে কোন বিষয়ে প্রাথমিক পর্যায়ে বিচার করিতে পারিতেন, তাঁহাদের ক্ষমতার মধ্যে না থাকিলে তাহা বিচারার্থে দেওয়ান কিংবা তালুকদারের নিকট প্রেরণ করিতেন। তাঁহারা প্রকৃত পক্ষে নিজস্ব এলাকাবাসীদের Friend Philosopher ও Guide হিসাবে কাজ করিতেন।

পূণ্যাহ

চাক্মা রাজ পূণ্যাহ তৎকালে পার্শ্ববর্তী চট্টগ্রামে সমগ্র পাহাড়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে ছিল একটা মহা আনন্দ ও মিলনের পূণ্য লগ্ন। এই দিনটা সাধারণতঃ অগ্রহায়ণ মাসে রাজা কর্তৃক নিদ্ধারিত হইত। এই পূণ্যাহ দিনে দেওয়ান তালুকদারেরা প্রজাদের নিকট হইতে খাজনা উসল করিয়া রাজ ভাণ্ডারে জমা দেওয়ার জন্য সকলে সমবেত হইত। এই পূণ্যাহ দিনটি মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হইত। এই উৎসবে হাজার হাজার লোকের সমাগম হইত এমনকি পার্শ্ববর্তী চট্টগ্রামের বাহির হইতেও বহু লোক আসিয়া এই পূণ্যাহ উৎসবে যোগদান করিত। কলিকাতা ও ঢাকা হইতে যাত্রা দল আসিয়া এই সমাগত লোকদের আনন্দ দান করিত। রাজ ভাণ্ডার হইতে নংগরখানা খুলিয়া দিয়া এই সমাগত লোকদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করা হইত।

রাজা সুসজ্জিত বিরাট চন্দ্রাতপতলে পাত্র মিত্র ও দেওয়ান তালুকদার গণের

ছারা পরিবেষ্টিত হইয়া একটা বিশিষ্ট কারু কার্য্য শোভিত মণ্ডপে রাজকীয় পোষাক পরিহিত হইয়া উপবেশন করিতেন ।

রাজ প্রসাদ হইতে বিরাট শোভা যাত্রা সহাকারে সুসজ্জিত হস্তী পৃষ্ঠে উপবেশন করিয়া প্রকাণ্ড রাজপ্রাসাদের প্রাঙ্গণে ঐ চন্দ্রাতপতলে আয়োজিত রাজ দরবারে মন্ত্ৰ গতিতে গমন করিতেন । রাজ ছত্রধর তুচ্ছ চান রাজাকে সূর্য্য কিরণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য রাজা বাহাদুরের মাথার উপর সুবর্ণ রঞ্জিত ছত্র ধারণ করিতেন । রাজ দরবার জন সমাবেশে পরিপূর্ণ হইলে তোপধ্বনীর সহকারে খাজনা উসল করার কাজ শুরু হইত । রাজা কেবল দর্শক হিসাবে উপবিষ্ট থাকিতেন । রাজ আমলা বৃন্দই সব কাজ করিত । তখন কার দিনে নোট প্রচলন ছিলনা । খাঁটি রৌপ্য মুদ্রাই প্রচলন ছিল । তখন দেখিয়া ছিলাম ধপ্ ধপে সাদা স্তূপাকারে সাজান রৌপ্য মুদ্রা । এই সব মুদ্রা গণনা করিয়া এক এক হাজার করিয়া এক একটা হাজারী তোরায (কাপড়ের থৈলের ভিতর) সারি সারি করিয়া রাখা হইত । পরে এই সব টাকা রাজ কোষাগারে জমা হইত ।

এই উৎসব ২/৩ দিন চলিত । তৎকালে পার্বত্য চট্টগ্রামে অন্য কোন আমোদ প্রমোদের বিশেষ ব্যবস্থা না থাকায়, বৎসরে এই একটা দিন পূণ্যাহ উপলক্ষে কিছু আমোদ উৎসব ভোগ করার জন্য পাহাড়ীদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক এই উৎসব যোগদান করিত ।

১৯২৫ ইংরেজী এই পূণ্যাহ দিন উপলক্ষে রাজা ভূবন মোহন রায় তাহার প্রথমারানীর দুই পুত্র যুবরাজ নলিনাক্ষ ও কুমার বীরপাক্ষ রায়ের অসবর্ণ বিবাহ সুসম্পন্ন করিয়া দেন । যুবরাজের বিবাহ হয় ব্রাহ্মণ সমাজ প্রবর্তক ব্রহ্মানন্দ কেশব সেনের ছেলে ব্যারিষ্টার সরল সেনের প্রথম কন্যা কুমারী বিনীতা সেনের সহিত এবং কুমার বাহাদুরের বিবাহ হয় তৎকালীন ত্রিপুরা মহারাজার নিকট আত্মীয় কুমার ভূপেন্দ্র নারায়ণের ৪র্থ কন্যা কুমারী সুধীরার সহিত । রাজা ভূবন মোহন রায়ের মৃত্যুর পর যুবরাজ নলিনাক্ষ রায় রাজ সিংহাসনে আরোহণ করেন । তাহার পত্নী রানী বিনীতা রায় এখনও বর্তমান । তিনি বর্তমানে পাকিস্তানের অধিবাসী, রাজা ত্রিদিব রায়ের মা ।

ঐ সময় সমগ্র চাকমা জাতি বা সমগ্র পার্বত্য জাতি পার্বত্য চট্টগ্রামের বেটনীর মধ্যে থাকিয়া স্ব স্ব সমাজের গভীর ভিতর প্রকৃতি মায়ের নিরীহ সন্তানের ন্যায় প্রাকৃতিক

সরল জীবন যাপন করিত। বহির্জগতের সাথে কোন সম্পর্ক নাই বলিলে চলে। চাষ হইতে বৎসরের খোরাকী ও জুম হইতে কিছু কার্পাস উৎপন্ন করিতে পারিলেই যথেষ্ট। কার্পাস হইতে পরিধেয় বস্ত্রাদি জাতীয় তাঁত হইতে তৈয়ার করিয়া লইত বাহির হইতে বাঙ্গালীরা ব্যবসা বাণিজ্য করিতে যাইত এবং ব্যবসায়ীরা ব্যবসার মাধ্যমে সরল পাহাড়ীদের নিকট হইতে অর্থনৈতিক ক্ষমতা সব গ্রাস করিয়া লইত।

পাহাড়ীরা বিশেষ ভাবে চাক্‌মারা চাষের কাজ কর্তৃ সমাপ্ত হইয়া গেলে বিশেষতঃ ফাল্গুন চৈত্র মাসে নানা প্রকার দেশীয় খেলায় মত্ত হইয়া থাকিত। ইহার মধ্যে “বলী” খেলা একটা উল্লেখযোগ্য খেলা। “অর্থাৎ মল্লযুদ্ধ” এই খেলায় যোগদানের জন্য বহু লোকের সমাগম হইত, ইহাতে সমাজের বিশিষ্ট লোকেরা বীর পালোয়ানদের পুরস্কার বিতরণ করিত, এছাড়া নারিকেল খেলা একটা উল্লেখযোগ্য খেলা, তখন নারিকেল এক পয়সায় ২/৩ টা পাওয়া যাইত। ভাসন্যা বেপারীরা এই নারিকেল ব্যবসা করিত। আরও অন্যান্য খেলা আছে যেমন নাদেং খারা, ঘিলা খারা, গুদু খারা, পন্তি খারা ইত্যাদি। এমন কি বয়স্ক লোকেরাও এসব খেলায় মত্ত থাকিত। অর্থাৎ চাক্‌মারা ছিল অল্পে তুষ্ট। ভবিষ্যৎ উচ্চাআজ্জা বলিতে বিশেষ ছিল না।

পূজা ৪- চাক্‌মাদের মধ্যে (১) “ভাদ্যা” একটা বড় পূজা অর্থাৎ পূর্ব পুরুষের উদ্দেশ্যে অনুদান করা। এই পূজা দ্বারা নাকি পুনঃ জন্ম বুঝিতে পারা যায় এই পূজা এক গুপ্তির অন্তরভুক্ত সমস্ত লোকে সম্মিলিত ভাবে করে। এছাড়া আছে (২) “মাথা ধোয়া” অর্থাৎ পবিত্র হওয়া (৩) মা লক্ষী মাকে ভাত, অর্থাৎ গৃহ লক্ষীকে নবান্ন দান। (৪) গাং শালা অর্থাৎ গঙ্গা পূজা (৫) গাং এ ভাত জরা দেওয়া ছোট বাচ্চার অসুখ করিলে মা বাচ্চার আরোগ্য কামনা করিয়া নদীর জলে ভাত ছিটিয়ে দেয় (৬) এদা ডাগা-অপদেবতার হাত হইতে বাচ্চাকে রক্ষা করলে পূজা দেওয়া (৭) চেলারে শুকর অর্থাৎ যম পূজা। চাক্‌মাদের এই সব পূজা অর্চনার মধ্যে বেশীর ভাগই হিন্দু পূজার মধ্যে গন্য। বিবাহে চুওলাং একটা অপরিহার্য প্রথা ইহা না করিলে সামাজিক মতে বিবাহ সিদ্ধ হয় না।

ধর্ম ৪- চাক্‌মারা নিজস্ব বৌদ্ধ ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া অন্য ধর্মে খুব কমই দীক্ষিত হয়। তখন খেংজী গোজা ২/১ পরিবার এবং মুলিমা খোজা সোনা রাম অন্তরের সহিত খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন।

তখন চাক্‌মা ও অন্যান্য পাহাড়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার অগ্রগতি খুবই কম ছিল।

এ যুগে চাক্‌মারা ছিল তন্ত্র মন্ত্রে ও অপদেবতা পূজা অর্চনার খুবই বিশ্বাসী। এ প্রসঙ্গে আমার একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার মনে পড়ে। তখন আমি ৭ম ও ৮ম শ্রেণীর ছাত্র। ঘোর পেটের অসুখে ভুগিতে ছিলাম একথা আমি পূর্বেও কিছুটা উল্লেখ করিয়াছি। একদিন আমার মা, আমার চিকিৎসার্থ আমাকে লইয়া গেলেন তৎকালীন প্রসিদ্ধ বাজী বৈদ্যের নিকট। ঐ বৈদ্য আমাকে চিৎ করিয়া শোয়াইয়া আমার পেটে চাপ দিয়া মন্ত্র উচ্চারণ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং আরও অনেক কিছু করিলেন তারপর মাকে বলিলেন “তোমার ছেলে ভাল হইয়া যাইবে, কোন ঔষধ খাওয়ার প্রয়োজন হইবে না তবে একটা কাজ করিতে হইবে। আমি দেখিতেছি, তোমাদের বাড়ীর উত্তর দিকে একটি ছোট ছড়ার মাথায় একটি ছোট কুয়া আছে। (সাধারণত পাহাড়ীররা ছোট ছড়ার ধারে সামান্য মাটি কুড়িয়া ছোট ছোট কুয়া করে। ঐ কুয়াতে যেই জল বাহির হয় সেই জলই পান করে) একদিন তোমার ছেলে একা গিয়া ঐ কুয়া হইতে জল পান করিয়াছিল, আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তাই নয়কি? আমি উত্তর দিলাম।- হাঁ! তারপর বলিতে লাগিলেন -ঐ কুয়ার ভিতর একটা ভূত আছে - ঐ ভূতের নাম “চিরুক” ঐ ভূতটাই তোমার ছেলের প্রতি কুট দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছে অতএব সহসা ঐ ভূতের উদ্দেশ্যে একটা কিছু ডালি (চাক্‌মা কথায়) না দিলে তোমার ছেলের অনিষ্ট হইবে। বিশেষ কিছু করার প্রয়োজন নাই, কেবল একজন ওঝাকে দিয়া একটি ছোট মুরগীর বাচ্ছা কাটিয়া ঐ চিরুক ভূতের নামে ডালি দিও। ইহাতে তোমার ছেলের রোগ ভাল হইয়া যাইবে। মা এই কথা শুনিয়া খুবই সন্তোষিত হইলেন এবং আমাকে সঙ্গে লইয়া বৈদ্যের নিকট হইতে বিদায় হইলেন এবং বৈদ্যকে কিছুটা দক্ষিণাও প্রদান করিলেন বলিয়া মনে পড়ে।

তারপর দিন মা আমাদের পাড়ার এক বৃদ্ধ ওঝাকে ডাকিয়া বলিলেন তুমি এই মুরগীর বাচ্ছাটি লইয়া ঐ যে বাড়ীর উত্তর দিকে একটি ছোট কুয়া আছে। এ কুয়ার ভিতর চিরুক নামে একটি ভূত আছে সেই ভূতকে পূজা দিয়া আস, যাহাতে বাব এর অসুখ ভাল হইয়া যায়। ইহা বৈদ্যের নির্দেশ। সঙ্গে বাবকে (মা আমাকে বাব বলিয়া ডাকিতেন) ও দরকে লইয়া যাও। দাদার নাম বীরেন্দ্র। (মা সংক্ষেপে দাদাকে ডাকিতেন দর) দাদা কিন্তু এই কথা শুনিয়া একটু ইতস্ততঃ করিল এবং যাইতে রাজী

হইলেন না । শেষ পর্যন্ত মার কথা ঠেলিতে না পারিয়া আমাদের সঙ্গে গেলেন । আমরা তিনজন, ওঝা আমি আর দাদা ।

ঐ কুয়ার ধারে ছোট একটি পূজার মঞ্চ ওঝা তৈয়ার করিল- মঞ্চটি এই রকম ছোট একটি মাটির দলার উপর একখানা বাঁশের কঞ্চি এক মাথায় সামান্য দরির মত করিয়া ঐ মাটির দলার উপর পুতিয়া দিলেন, অনুমান করি উহা কাল্পনিক ভূত নির্ধান করা হইয়াছে । ঐ মাটির দলার উপর দুইটা আম্র পল্লব রাখা হইল এবং ঐ বাচ্চা মুরগীটাকে কাটিয়া রক্ত ও মাথা সহ ঐ কাল্পনিক ভূতের পায়ে রাখিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন “যেমন -ও ভূত তোমাকে এই মুরগীটি ভোগ দিচ্ছি তুমি এই ভোগ লইয়া অন্যত্র চলিয়া যাও এবং প্রমোদকে (আমাকে) ছাড়িয়া দাও, তার পেটের অসুখ যাহাতে ভাল হয়, এই ভাবে আমাকেও ভূতের নিকট প্রার্থনা জানাইতে নির্দেশ দিলেন । অতএব আমিও গভীর ভক্তি সহকারে ভূতের কাছে প্রার্থনা জানাইতে আরম্ভ করিলাম যাহাতে আমার রোগ সহসা ভাল হয় । এই ভাবে আনুষ্ঠানিক পূজা পর্ব শেষ হওয়ার পর ঐ ওঝা ভূত সন্তোষ্ট না অসন্তোষ্ট রহিয়া গেল ইহা পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে দুই আঙ্গুলের ফাকে দুইটি আম পাতা ধরিয়া লইয়া মন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে ভূতের পায়ে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন । কথিত আছে যদি একটি পাতা চিৎ হইয়া এবং অপরটি উপর হইয়া পরে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে ভূত কিম্বা যে কোন দেবতা ভোগ পাওয়ার পর খুবই সন্তোষ্ট আর যদি দুইটি পাতাই উপর হইয়া পরে তাহা হইলে বুঝিতে হইতে হইবে দেবতা খুবই অসন্তোষ্ট এবং ঐ দুইটি পাতাই যদি চিৎ হইয়া পরে তাহাতে বুঝা যায় ভূত কিম্বা দেবতা হাসিতেছে এবং সে আরও কিছু ভোগ চায় । এই ভাবে ঐ ওঝা ৪/৫ বার ভূতের পায়ে ছুড়িয়া দিল কিন্তু প্রতি বারেই ঐ দুইটি পাতা উপর ইয়া পরিল । তাতে বুঝা গেল ভূত কিছুতেই সন্তোষ্ট হয় না । এতক্ষণ দাদা নীরবে এক ধারে বসিয়া এই সব কার্য্য কলাপ নিরীক্ষণ করিতে ছিলেন শেষ পর্যন্ত দাদা রেগে দাঁড়াইয়া উঠিলেন এবং বলিতে লাগিলেন “ও ভূত তুমি এত অসন্তোষ্ট কেন? তুমি আমাদের এই ভোগ খাবেত খাও, না খাওত এখান থেকে চলিয়া যাও, তোমাকে আর পূজা দেবনা, এই বলিয়া পূজার মণ্ডপ ভাঙ্গিয়া দিয়া দাদা হন্ হন্ করিয়া বাড়ী চলিয়া আসিলেন, দাদার এই সব কাজ দেখিয়া ওঝা দাদাকে বলিতে লাগিলেন, তোমরা কিছু ইংরেজী শিখিয়া সাহেব হইয়াছে, এই সব ভূতে তুতে আর বিশ্বাস কর না । আমরা চিরকালই এই সব

করিয়া বাঁচিয়া আছি তোমরা হইলে আধুনিক যুগের ছেলে ইত্যাদি ।

এই ক্ষুদ্র উপখ্যান হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে তখনকার দিনে আমাদের চাক্মা সমাজে ও অন্যান্য পাহাড়ী সমাজে কি রকম ভূত, দেবতা ও অন্যান্য অপদেবতার পূজা দেওয়ার রীতি নিতি ছিল ও কুসংস্কারা বৃতি ছিল । কখনও দেশে সংক্রামক ব্যাধি দেখা দিলে মন্ত্র দ্বারা গ্রাম বন্ধ করিয়া রাখারও প্রথা ছিল । আমি একবার কলেরা (Cholera) Injection দিতে গিয়া এক মগের পাড়ায় আমাকে ঢুকিতে দেয় নাই । যেহেতু ঐ গ্রামটি মন্ত্র দ্বারা বন্ধ করা হইয়াছিল । অতএব কোন বাইরের লোক উক্ত গ্রামে প্রবেশ করা নিষেধ ।

আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত চিকিৎসার প্রথা তখনকার দিনে পাহাড়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে মোটেই প্রচলন ছিলনা বলিলেও চলে । দেশীয় বৈদ্য, ওঝা ও ফকিরের প্রভাবই বেশী ছিল । তখন কার দিনে বাজী বৈদ্য ধারাধন বৈদ্য, পেত্যা ফকির রবান্যা ও অন্যান্য কয়েকজন ছিল প্রসিদ্ধ ।

বর্তমানে আমাদের মহামান্য ভারত সরকারের বিশেষ প্রচেষ্টায় অনুন্নত পার্শ্বত্যা জাতীর শিক্ষার অগ্রগতি দ্রুত প্রসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই সামাজিক কুসংস্কার সমূহ ক্রমশঃ বিলুপ্তির পথে ।

ঐ সময় সমগ্র জেলার মধ্যে একটি মাত্র রাজ্যমাটি হাই স্কুল ছিল । পাহাড়ীদের মধ্যে সরকারী কর্মচারী সংখ্যাও খুব অল্প, উক্ত হাই স্কুলে এক মাত্র Graduate Teacher ছিলেন স্বর্গীয় রাজেন্দ্র নাথ তালুকদার । চাক্মাদের মধ্যে শিক্ষা প্রেরণা জাগ্রত করার ক্ষেত্রে স্বর্গীয় কৃষ্ণ কিশোর চাক্মার ছিল যথেষ্ট অবদান । চাক্মা নেতা স্বর্গীয় কামিনী মোহন দেওয়ান ছিলেন তৎকালে পাহাড়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে একমাত্র রাজনীতিবিদ ।

পূর্বেই বলিয়াছি চাক্মারা নিজ সমাজ গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়া সীমিত দৃষ্টির মধ্যে সরল জীবন যাপন করিত । মাত্র কতিপয় চাক্মা কোন একটা কারনে সমাজের Main stream হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তৎকালীন ত্রিপুরা মহারাজার রাজ্যে আসিয়া বসবাস করিতে ছিলেন । মূলতঃ আমরা একই । তৎকালীন চাক্মা সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে মাত্র ২/৩ জন পার্শ্বত্যা চট্টগ্রামের গণ্ডী ছাড়িয়া বাহিরে চাকুরী করিতেন । তাহাদের

পক্ষে পার্শ্বত্যাগ চট্টগ্রামের বাহিরে যাইয়া চাকুরী করা একটা অসম্ভব ব্যাপার, এ সম্পর্কে একটা ঘটনা উল্লেখ করিতেছি- তখনকার সিভিল সার্জার্স অফিসে বিনোদ লাল চাকমা নামে এক ভদ্র লোক Head-Clerk পদে কাজ করিতেন, তিনি কোন দিন পার্শ্বত্যাগ চট্টগ্রামের বাহিরে এক পাও যান নাই। ঐ সময় পাবনা জেলার Head-Clerk কে কোন একটা অপরাধের জন্য শাস্তি মূলক ভাবে- বিনোদ বাবুর স্থলে রাঙ্গামাটিতে এবং বিনোদ বাবুকে ঐ হেড ক্লার্ক এর জায়গায় পাবনা জেলাতে বদলী হওয়ার আদেশ দেওয়া হয়। এই আদেশ পাইয়া বিনোদ বাবুর মাথায় যেন বিনা মেঘে বজ্রাঘাত। তিনি সঙ্গে সঙ্গে সবিনয়ে Civil Surgeon সাহেবকে বলিলেন, Sir, পাবনার Head Clerk কে আমার জায়গায় আমাকে পাবনায় বদলী করিয়া তাঁহাকে দিচ্ছেন Punishment, আর তাঁহার জায়গায় আমাকে পাবনায় বদলী করিয়া আমাকে দিচ্ছেন -Banishment (নির্বাসন) এই কথা শুনিয়া সিভিল সার্জার্স সাহেব হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন “বিনোদ বাবু, “আপনি এত সরল” বিনোদ বাবু উত্তরে বলিলে Sir, আমার জীবনে এখনও পর্যন্ত চন্দ্রঘোনাও দেখি নাই (এই চন্দ্রঘোনা পার্শ্বত্যাগ চট্টগ্রামের অন্তর্গত রাঙ্গামাটি হইতে মাত্র ১৫/২০ মাইলের মধ্যে) কাজেই পাবনা যাইয়া চাকুরী করা আমার পক্ষে কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? সঙ্গে সঙ্গে এই আদেশ বাতিল হইয়া গেল। এই ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত হইতে দেখা যায় তখন চাকমাদের মধ্যে বহির্জগত সম্বন্ধে তাহাদের দৃষ্টি ভঙ্গী যে কত সীমিত ছিল তাহা সহজে অনুমেয়।

চাকমাদের মত অতিথি পরায়ণ জগতে মনে হয় আর কোন জাতি নাই। রাত্রি যে কোন চাকমার বাড়ীতে যে কোন লোক জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে যদি আশ্রয় চায় তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই খাওয়া ও থাকার স্থান পাইবেই। রাত্রি অতিথিকে অভূক্ত রাখা একটা মহা পাপ বলিয়া চাকমারা মনে করে। সেকালে আরও নিয়ম ছিল যদি কোন বিবাহ যাত্রী কোন গ্রামের মধ্য দিয়া অতিক্রম করে তাহা হইলে উক্ত গ্রামের অধিবাসীদের প্রতি সম্মানার্থে একটা কিছু দিতে হইবে সাধারণত মদের বোতল, পান, সুপারী ইত্যাদি গ্রামের মোরলের হাতে তুলিয়া দেয় কিম্বা গোলাক ফুটাইয়া গ্রাম বাসীদের প্রতি সম্মান দেখান হয়। নচেৎ গ্রামবাসীরা নূতন বৌ-কে আটক করিয়া রাখিয়া দিতে পারে। সম্মানিত ব্যক্তিদের সাধারণতঃ বিবাহ উপলক্ষে এক বোতল মদ, পান এক বিড়া ও সুপারী এবং অনেক ক্ষেত্রে ২/১ টাকা নজর দিয়া নিমন্ত্রণ করা হইত

এবং নিমজ্জিত ব্যক্তি ও তাহার সম্মান রক্ষার্থে ঐ বিবাহে একটা বড় অঙ্কের টাকা শিকলী হিসাবে দিতে হইত। আমোদ উৎসবের জন্য চাক্মা যাত্রা দলের ব্যবস্থা থাকিত, বাঙ্গালী ঢুলীও চট্টগ্রাম হইতে যাইত। চাক্মার বিবাহে মেয়ের বাবা ছেলের বাবা হইতে দাবা হিসাবে টাকা পাইত। তখনকার দিনে হাজার খানেক টাকা জমাইতে পারিলে সে এক মহাজন বা ধনী ব্যক্তির মধ্যে গণ্য হইত। ঐ যুগে স্বর্গীয় ফুলেশ্বর মহাজন ছিলেন ধনী শ্রেষ্ঠ, অবশ্য তিনি বিরাট স্থাবর সম্পত্তি ও কয়েক হাজার টাকার মালিক ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তখন আমাদের দেশে ব্যাংক (Bank) ছিল না। মহাজনেরা পিতলের হাড়িতে মাটির ভিতর গুপ্ত জায়গায় রৌপ্য মুদ্রা লুকাইয়া রাখিত।

চাক্মাদের মধ্যে মেধাবী বা ধী সম্পন্ন ব্যক্তির কোন অভাব ছিলনা। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সব লোক তাহাদের প্রতিভা প্রস্ফুটিত করিয়া তুলিবার কোন সুযোগ পাইত না। এ সম্পর্কে একজন লোকের নাম উল্লেখযোগ্য মনে করি। ইনি হইলেন মুলিমা গোজা উপরোক্ত ফুলেশ্বর মহাজনের ঘনিষ্ট আত্মীয় নাম ননা কাজী। তিনি ছিলেন একজন অসাধারণ প্রত্যুৎপন্ন মতিও সম্পন্ন ব্যক্তি। বাঙ্গালীদের মধ্যে গোপাল ভাড়ের কথা হয়ত অনেকে শুনিয়া থাকিবেন। তাঁহার তড়িৎ বুদ্ধিমত্তা ও পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে বহু গল্প আছে। ননা কাজীও ছিলেন চাক্মাদের মধ্যে একজন গোপালভাড়া বিশেষ। তিনি লেখাপড়া জানিলে জীবনে অনেক কিছু করিতে পারিতেন। চাক্মাদের মধ্যে চারণ কবির (গেংখুলী)ও অভাব নাই। এসব ধী-সম্পন্ন ব্যক্তি সুযোগের অভাবে অপ্রস্ফুটিত অবস্থায় বিলীন হয়ে যায়।

চাক্মা পুরুষানুক্রমে পার্শ্বত্যা চট্টগ্রামের বেষ্টনীরা একটা “Compact Body” এর ন্যায় স্ব সমাজে বসবাস করিয়া একটা সরল জীবন যাপন করিয়া আসিতে ছিল। তখন তাহাদের মধ্যে ছিল সুখ, শান্তি ও পরস্পর প্রতি একটা সৌহার্দ্য ও স্নেহ মমতার বন্ধন। কিন্তু মহা দুর্যোগ, হয়ে গেল ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত এবং বঙ্গদেশ ও দ্বিখণ্ডিত হইয়া সৃষ্টি হইল পূর্ব পাকিস্তান এবং সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ভাবে পার্শ্বত্যা চট্টগ্রাম হয়ে গেল পাকিস্তানে অন্তরভুক্ত, দেখা দিল সমস্ত অমুসলমান পার্শ্বত্যা জাতীর ভাগ্যাশেষ এক মহা দুর্যোগ। তখন বহু যুগের রাজনৈতিক দিক দিয়ে নিদ্রিত চাক্মা জাতি তথা সমগ্র পার্শ্বত্যা জাতি সুখ নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া দিশাহারা অবস্থায় কিং কর্তব্য বিমূঢ় হইয়া পরিল। শুরু হয়ে গেল পার্শ্বত্যা চট্টগ্রামের দীর্ঘ দিনের সুরক্ষিত অঞ্চলের

(Excluded area) বিধি নিষেধ ত্যাগ করিয়া ব্যাপক ভাবে বাহির হইতে মুসলমানের অনুপ্রবেশ। ফলে পাহাড়ী সম্প্রদায় সংখ্যা লঘু হইয়া গেল। আরম্ভ হইল পাহাড়ীদের উপর নিদারুণ অত্যাচার ও নির্যাতন এবং রাজনৈতিক চাপ, আরও তদুপরি কর্ণফুলী নদীর উপর, রাঙ্গামাটির নীচে কাপটাই নামক স্থানে একটা প্রকাণ্ড বাঁধ তৈয়ার হওয়ার ফলে দারুণ অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিল পাহাড়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে। সমগ্র জেলার প্রায় অধিকাংশ জমি হয়ে গেল জল মগ্ন, ফলে পাহাড়ীরা আরও দুর্গম পর্বত চূড়ায় ও বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়। এই সব নির্যাতনের ফলে পাহাড়ীদের মধ্যে দেখা দিল দারুণ বিপর্যয় ও প্রচণ্ড ঘা, ভাঙ্গিল তাহাদের যুগ যুগান্তরের সুখ নিদ্রা-এবং জাগিল মনে চেতনা। জাতীর অস্তিত্ব রক্ষা করলে গভীর চিন্তায় হইল নিমজ্জিত। তারপর শুরু হয়ে গেল পুরুষ পরম্পরা জন্মভূমি, ভিটা বাড়ী, সর্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া, সম্পূর্ণ নিস্বল ও অসহায় অবস্থায় কেবল প্রাণটা নিয়ে দুর্গম পাহাড়ী রাস্তা পদব্রজে অতিক্রম করিয়া একটু আশ্রয়ের আশায় ভারত ভূমিতে দলে দলে প্রবেশ। এভাবে হাজার হাজার লোক আসিল। বহু বৃদ্ধা বৃদ্ধ শিশু, মেয়ে অনাহারে ও রোগ গ্রস্ত হইয়া, এই দুর্গম রাস্তা অতিক্রম করা কালে প্রাণ হারাইল।

এদিকে মহামান্য ভারত সরকার মানবতার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এই অসহায় ছিন্নমূল আশ্রয় প্রার্থীদের ভারতের বিভিন্ন জায়গায় যেমন মিজোরাম, ত্রিপুরা, আসাম মিকির হিল, অরুণাচল ইত্যাদি স্থানে পূর্ববাসনের ব্যবস্থা করিয়া দেন এবং প্রাণ ধারনের জন্য এককালীন আর্থিক ও অন্যান্য সাহায্য প্রদান করেন এবং সাময়িক বসবাসের জন্য বিভিন্ন জায়গায় আশ্রয় শিবিরও খুলিয়া দেন। ভারত সরকারের এই মহান উদারতা ও সহায়তা লাভ করিতে না পারিলে এই অসহায় আশ্রয় প্রার্থীরা সকলে অনাহারে মৃত্যু বরণ করিত। রাষ্ট্র বিপ্লবের শিকার হইয়া এই চাকমা জাতি নিজ সমাজ বেষ্টনীর বাহিরে আসিয়া ভারতের বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন জাতে ও বিভিন্ন পরিবেশে ছিটকাইয়া পরিতে বাধ্য হইল। ইহাতে কিন্তু আমার মতে চাকমাদের মধ্যে লাভ লোকসান উভয়ই হইয়াছে। ইংরেজীতে বলে “It is a blessing in disguise” অর্থাৎ গুপ্ত বেশে ভগবানের আশীর্বাদ। কেননা এই ছিটকাইয়া যাওয়ার ফলে চাকমাদের জ্ঞান চক্ষু এখন বহু দূর প্রসারিত। পূর্বেকার সীমিত দৃষ্টিভঙ্গী আর নাই। এখন তাহাদের সাহস, দূরদর্শীতার জ্ঞান, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, ও মনোবল ইত্যাদি বহু গুণে বর্ধিত। এখন তাহারা যে

কোন পরিশ্রমিতে যে কোন অবস্থায় সম্মুখীন হইতে সক্ষম ও সাহস রাখে ।

এই রাষ্ট্র বিপ্লবের অন্যতম শিকার রাজা ত্রিদিব রায়ও স্বজাতি বিবর্জিত অবস্থায় পাকিস্তানে আশ্রয় লইতে বাধ্য হয় । গত ১৯৭২ ইংরেজীতে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙ্গালী মুসলমানরা পাকিস্তান গবর্নমেন্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে, ফলে পূর্ব পাকিস্তান বিলুপ্ত হইয়া যায় । তখন ত্রিদিব রায় নিজ রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিম পাকিস্তানে পলায়ন করিতে বাধ্য হন ।

এই ছিন্ন বিচ্ছিন্ন চাকমা জাতি বিভিন্ন সমাজে, বিভিন্ন পরিবেশে ও বিভিন্ন জায়গায় দীর্ঘদিন বসবাসের ফলে তাহাদের ভাবী বংশধরেরা বিভিন্ন সামাজিক প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া ভবিষ্যতে নিজ জাতীয় কৃষ্টি আচার অনুষ্ঠান এমন কি ভাষা পর্যন্ত যে ভুলিয়া যাইবে এ বিষয়ে আর সন্দেহের অবকাশ নাই এবং এই গতি রোধ করারও কোন উপায় নাই । যাই হউক এবিষয়ে আমার ব্যক্তিগত অভিমত, যে যেখানে থাকুক না কেন যদি প্রত্যেকে আগ্রহী হইয়া জাতীয় ভাষা প্রচলন রাখিতে চেষ্টা করে তাহা হইলে ভবিষ্যৎ বংশধরদের মধ্যে পরিচিতি রক্ষা কল্পে অনেকটা সহায়ক হইতে পারে । আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে আমি মনে করি মানুষের মধ্যে আকর্ষণ ও মিলনের ক্ষেত্রে ধর্ম বা আঞ্চলিক প্রভাবের চেয়ে ভাষার প্রভাব বহু গুণে শক্তিশালী ।

আমাদের ভাবী বংশধরের মধ্যে পরিচিতি, জাতীয় কৃষ্টি ও আচার অনুষ্ঠান বা Identity রক্ষা কল্পে যদি কেহ আরও উৎকৃষ্ট উপায় বা পন্থা উদ্ভাবন করিতে পারে তাহা হইলে তাহা সকলের গ্রহণ করা উচিত । নচেৎ কালের প্রবাহে এই ছিন্ন বিচ্ছিন্ন চাকমা জাতি বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সামাজিক প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া আত্ম পরিচিতি ভুলিয়া গিয়া ভিন্ন সমাজে বিলীন হইয়া যাইবে, ইহা সুনিশ্চিত, ফলে আমাদের ক্ষুদ্র জাতি আরও ক্ষুদ্রতর হইয়া পড়িবে । এক্ষেত্রে আমাদের চাকমা জাতীয় “Scripts” এর উন্নতি সাধন করা খুবই প্রয়োজন মনে করি এবং এ বিষয়ে মহামান্য ত্রিপুরা সরকারের কৃপা দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হউক ইহাই কাম্য । একটি ক্ষুদ্র কবিতাকারে নিম্নে আমার দীর্ঘ দিনের মনের আবেগ প্রকাশ করিলাম :-

ওহে, মোর চাকমা ভ্রাতৃ-ভাগিনীগণ,
তোমাদের জাতির নাম, এই নিবেদন-

“জাগাতে জাতির নাম, দিক্ দিগন্তর
চল সবে বীর দর্পে, দেশ দেশান্তর”
তবে কিন্তু মনে রেখো “জাতি পরিচয়”
কোন মতে এতে যেন, ভ্রান্তি নাহি হয় ।।
ছিন্ন বিচ্ছিন্ন জাতের পরিচিত ভূমে,
সহায় হইবে মাত্র ভাষার মাধ্যমে ।।
অতএব, করি আমি এই নিবেদন,
চাক্মা ভাষা রক্ষিতে হও সচেতন ।
আরও আমি নিবেদিব,
কর দৃঢ় পণ ।।
এ জগতে চাক্মা জাতে
করিতে স্থাপন ।।
মুছিয়া ফেলিয়া ঐ,
জুমিয়া জীবন ।।
জাতি কল্যাণ পথে,
হও আগোয়ান ।।
“জয় হিন্দু”

-ঃ সমাপ্তি :-

চাকমাদের মধ্যে যাহারা বিশেষ কোন
পারদর্শীতায় প্রথমস্থান অধিকার করিয়াছেন
তাহাদের নাম নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইল

- ১। কৃষ্ণ চন্দ্র দেওয়ান - তদানিন্তন বৃটিশ সরকার হইতে “রায় সাহেব” উপাধী লাভ করিয়া সম্মানিত হন, ও Sub Deputy Magistrate ও চাকমা জাতীর অদ্বিতীয় নেতা এবং রাজা ভুবন মোহন রায়ের নাবালকত্বের সময় চাকমা রাজত্ব পরিচালনা করেন।
- ২। রাজা ভুবন মোহন রায় - প্রথম Entrance পরীক্ষায় আনুমানিক ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে উত্তীর্ণ হন।
- ৩। ডাক্তার মদন মোহন দেওয়ান - প্রথম ডাক্তার L.M.F
- ৪। যামিনী কুমার দেওয়ান - প্রথম Graduate (B.A)
- ৫। কামিনী মোহন দেওয়ান - চাকমা নেতা, রাজনীতিবিদ ও জমিদার।
- ৬। কৃষ্ণ কিশোর চাকমা - B.A. চাকমা সমাজে শিক্ষা বিস্তারকল্পে তিনিই বিদ্যুৎসাহী ও কর্মবীর।
- ৭। রাজেন্দ্র নাথ তালুকদার -B.A.B.T প্রথম Govt. High School এ English Teacher.
- ৮। যামিনী কুমার চাকমা -Veterinary Surgeon.
- ৯। ডাক্তার নির্মল চন্দ্র দেওয়ান - প্রথম M.B.B.S.
- ১০। বল ভদ্র তালুকদার -B.A. কানুনগো পরে Deputy Magistrate.
- ১১। ভুবন চন্দ্র চাকমা -1st B.A.Bt.
- ১২। কোকন দাক্ষ রায় - প্রথম M.A.

- ১৩। পুলিন চন্দ্র দেওয়ান -Overseer পরে Engineer.
- ১৪। মনোরমা দেওয়ান - মেয়েদের মধ্যে প্রথম Matriculate
- ১৫। বকুল রানী চাকমা - মেয়েদের মধ্যে প্রথম I.A. পাশ।
- ১৬। বীরপাক্ষ রায় -বৃটিশ সরকার কর্তৃক “রায় বাহাদুর” উপাধিতে সম্মানিত হন।
- ১৭। ডাঃ প্রমোদ বিকাশ তালুকদার - (লেখক নিজে) ২য় মহাযুদ্ধের সময় প্রথম Commissioned Rank প্রাপ্ত Captain.
- ১৮। বিঘ্ন বিনাশন খীসা- I.F.S From Forester to D. F. O.
- ১৯। উত্কল মুনী চাকমা - Captain. Commissioner.
- ২০। সুর কৃষ্ণ চাকমা- B. Com. প্রথম Reserved Bank of India তে চাকুরী লাভ করেন।

ভারতীয় চাকমাদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকারী

- ১। মুর্কুর কান্তি খীসা - Indian Foreign Service Ambassador.
- ২। পুষ্পাক্ষ চাকমা - W.B.C.S, S.D.O
- ৩। শাক্য প্রসাদ তালুকদার - Marine Engineer (World Tourist)
- ৪। ঘনশ্যাম দেওয়ান - M.L.A.
- ৫। হংস ধ্বজ দেওয়ান - প্রথম মন্ত্রী
- ৬। অঞ্জলী তালুকদার - মেয়েদের মধ্যে প্রথম B.A.B.T.
- ৭। মনিকা তালুকদার - মেয়েদের মধ্যে প্রথম M.A.B.T.
- ৮। দেব প্রসাদ তালুকদার - Indian Air Force এ Squadron Leader
- ৯। অমিতাভ খীসা - B.A. Indian Air Lines এ প্রথম।
- ১০। জ্ঞান মুকুল দেওয়ান - M.Sc. Agriculture.
- ১১। তপতি দেওয়ান - Customs Department এ Deputy Superintendent.
- ১২। মালতী দেওয়ান - B.Sc. মেয়েদের মধ্যে প্রথম।
- ১৩। উজ্জ্বলা চাকমা - মেয়েদের মধ্যে প্রথম Air India তে চাকুরী।
- ১৪। পোষীয়া চাকমা - মেয়েদের মধ্যে প্রথম। M.B.B.S. ডাক্তার।
- ১৫। সনাতন তালুকদার - প্রথম Direct I.F.S. (Indian Forest Service)
- ১৬। তুষার কান্তি চাকমা - প্রথম T.C.S. (Tripura Civil Service)
- ১৭। মনীষা তালুকদার - M.A, M. phil.